# অস্তিত্বহীনতার শান্তি

অনুবাদ

শামস অর্ক
মোহনা সেতু
রিসাদ রনি

# অস্তিত্বহীনতার শান্তি

যেভাবে কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাবো, কষ্ট প্রতিরোধ করতে পারবো এবং পাবো গভীরতর স্বাধীনতা ও শান্তি।

মূল বই

**'Ever Deeper Honesty'**

লেখকের নাম জানা যায়নি।

**উৎসর্গ –**

যারা অস্তিত্বের যন্ত্রণার উপলব্ধি থেকে নতুন কাউকে অস্তিত্বে না আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

**বিশেষ কৃতজ্ঞতায় –**

সুমিত মজুমদার

# প্রথম অংশ

## মূলভাব

(এক কথায়)

এমন কোনো স্বাধীনতা বা বিকল্প নেই যা জীবন (অস্তিত্ব) থেকে মুক্তির তাৎক্ষণিক, বেদনাহীন ও স্থায়ী উপায় হতে পারে। অতএব, জীবন হলো বন্দীশালা, দাসত্ব এবং পীড়ন আর সেজন্যই জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা নির্বুদ্ধিতা।

## মূলভাব

(সংক্ষিপ্ত)

মানুষ বা সমাজ সাধারণত দুই ধরনের।

এগুলোকে সংক্ষেপে এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে-

**★প্রথম ধরনের মানুষ বা সমাজ:**

এই ধরনের মানুষ বা সমাজ মনে করে, সবাইকে মৌলিকতম যে অধিকারটি অবশ্যই দিতে হবে তা হলো- যখনই তারা চায় তাদের যেন দুর্ভোগ থেকে তাৎক্ষণিক, বেদনাহীন ও স্থায়ী মুক্তির স্বাধীনতা থাকে।

এই অধিকার অবশ্যই থাকতে হবে কেননা যদি আপনার কষ্ট থেকে মুক্তির স্বাধীনতা বা অধিকার না থাকে তাহলে আপনাকে কেউ অপহরণ করে অন্ধ কুঠুরিতে বন্দী করে বাকি জীবন আপনাকে প্রতিদিন ধর্ষণ এবং নির্যাতন করলেও সেটা বৈধতা পাবে।

অর্থাৎ এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, আপনি অসহনীয় যন্ত্রণা বা দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে গেলেও আপনার কোনো অধিকার থাকবে না এই দুর্ভোগের অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করার।

এর মানে হলো, অপরাধী আপনার সাথে বাকি জীবন যেমন খুশি অন্যায় করার বৈধতা পাবে।

এজন্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল পর্যায়ে এই অধিকার বা স্বাধীনতা অবশ্যই থাকতে হবে; আর এটা হতে হবে প্রতিরোধমূলক। (আপনার সাথে অন্যায় সংঘটিত হওয়ার আগেই এই অধিকার আপনার থাকতে হবে)

তাই এই ধরনের মানুষ বা সমাজের প্রধান দুটি অগ্রাধিকার হলো-

**১.** সকল মানুষ অথবা অস্তিত্বশীল সত্তার চাওয়া মাত্রই এই দুর্ভোগের পরিস্থিতি (তা জীবন বা অস্তিত্ব হলেও) থেকে তাৎক্ষণিক, বেদনাহীন ও স্থায়ী মুক্তির স্বাধীনতা থাকবে।

**২.** নতুন সন্তান বা সত্তা জন্ম না দেওয়ার অধিকার থাকবে।

কেননা তারা জানে:

**(ক)**

কোনো শিশুকে অস্তিত্বে আনা হলে সে জীবনভর প্রতিনিয়ত দুর্ভোগ পোহাতে বাধ্য হবে। এর মানে, তাদেরকে দুর্ভোগ যেন সৃষ্টি না হয় সেজন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। একটি শিশুর জন্মের মুহূর্ত থেকেই জীবন সহজাতভাবেই একটি বন্দীশালা, দাসত্ব ও পীড়ন (দুর্ভোগ)। এজন্য একজন শিশুকে অস্তিত্বে আনা হবে চরম অনৈতিক।

আসলেই এমনটা করা চরম অনৈতিক। কেননা এর ফলে দুর্ভোগ সৃষ্টি হয় আর তারা জানে যে, দুর্ভোগ অপ্রয়োজনীয় এবং অগ্রহণযোগ্য (দুর্ভোগ কেউই চায় না)।

**দ্রষ্টব্য:** তাদের কাজ "স্বার্থপর এবং অনৈতিক", কারণ এটি সুস্পষ্ট (এবং অবিসংবাদিত) যে, যারা সন্তান জন্ম দেয় তারা সরাসরি দুর্ভোগ সৃষ্টি করছে। সেই যন্ত্রণা সন্তানটি জীবনভর প্রতিনিয়ত ভোগ করবে।

এবং

**(খ)**

একটা শিশু কখনোই জন্ম নেওয়ার অনুমতি দিতে পারে না। আর এজন্য শিশুকে জন্ম দেওয়া অনুমতিহীন কাজ (এর মানে হলো নিপীড়ন)। এছাড়াও এধরনের সমাজ বা মানুষ জানে যদি অনুমতিহীন কর্মকাণ্ডকে অনুমোদন দেওয়া হয় তাহলে এমন অনেক অনুমতিহীন কাজ ঘটতে শুরু করবে যা সবার দুর্ভোগ আরো বাড়িয়ে দিবে।

**★দ্বিতীয় ধরনের মানুষ বা সমাজ :**

এই ধরনের মানুষ বা সমাজ স্বার্থপর এবং অনৈতিক। কারণ তারা শুধুমাত্র চেষ্টা করে অন্য মানুষ বা সত্তাদেরকে তাদের দাস করে রাখতে অথবা ব্যবহার করতে ।

এজন্য তারা তাদের সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করে এটা নিশ্চিত করতে যে, কেউ যেন তাদের মৌলিকতম অধিকার (দুর্ভোগ থেকে তাৎক্ষণিক, বেদনাহীন ও স্থায়ীভাবে মুক্তির স্বাধীনতা) না পায়।

অতএব, তারা জীবনের সকল দিক এবং সকল স্তরের স্বাধীনতাকে রোধ করার চেষ্টা করে।

এই ধরনের মানুষ বা সমাজ যে দুটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেয় তা হলো-

**১.** নিশ্চিত করা যে, কারো যেন জীবন (অস্তিত্ব) থেকে তাৎক্ষণিক, বেদনাহীন ও স্থায়ী মুক্তির স্বাধীনতা না থাকে। আর এটা নিশ্চিত করতে তারা জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনেক সিস্টেম বা নিয়ম তৈরি এবং প্রয়োগ করবে যেন কেউ এ অধিকারটি না পায়।

**২.** এমন কাজ করতে উৎসাহিত, জবরদস্তি ও মগজধোলাই করা (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে) যা সন্তান (সত্তার) জন্ম দেয়।

কেননা তারা জানে,

**(ক)**

যখন একজন ব্যক্তি কোনো শিশুর জন্ম দেয় তখন সে জন্ম দেওয়ার অপরাধের অংশ হয়ে যায়। আর এজন্য ওই ব্যক্তিকে প্রতিনিয়ত নিজেকে এবং সবাইকে এটা বিশ্বাস করাতে মগজধোলাই করতে হয় যে,

- সন্তানধারণ করা ভালো, নৈতিক, নিঃস্বার্থ, গুরুত্বপূর্ণ ইত্যাদি।

- সন্তানধারণ করা আপনার জন্য সুখ, আনন্দ এবং ভালোবাসা বয়ে নিয়ে আসবে।

- কষ্ট বা দুর্ভোগ গ্রহণযোগ্য ও প্রয়োজনীয়।

- দুর্ভোগ জীবনের একটা অংশ (আর এজন্য আপনাকে, আমাকে, সকলকে এটা মেনে নিতে হবে)।

- মানুষকে ব্যবহার করা কিংবা দাস করে রাখা (ব্যক্তিগত বা পুঁজিবাদের দাস) গ্রহণযোগ্য এবং প্রয়োজনীয়।

**দ্রষ্টব্য:** মগজধোলাইয়ের উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে অন্ধ করে রাখা যেন তারা যখন কালো (খারাপ কিছু, যেমন- দুর্ভোগ) দেখে আপনি যেন তাদেরকে বলতে পারেন, এটা আসলে শাদাই (ভালো)। আর তারা আপনাকে বিশ্বাস করবে। (তাদের নিজেদের দুর্ভোগের অভিজ্ঞতার বাস্তবতাকে পাত্তা না দিয়ে আপনার বানানো সুখের গালগপ্প মেনে নিবে!)

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা তাদের যখন আপনি এমন তীব্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন তখনই তাদেরকে বিশ্বাস করাতে পারবেন,

- তাদের আসলে দুর্ভোগ নেই (যদিও তারা দুর্ভোগের মধ্যেই আছে )।

আর এর ফলে আপনি তাদেরকে প্রতিনিয়ত নিজের দাস (কর্মী) হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন।

অথবা

- তারা দুর্ভোগে আছে কিন্তু তারা নিজেরাই সেটা বিভিন্ন কারণে বেছে নিয়েছে বা চেয়েছে। আর এর ফলেও আপনি তাদেরকে প্রতিনিয়ত আপনার দাস (কর্মী) হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন।

**(খ)**

যদি নতুন শিশু (সত্তা) সৃষ্টি করা না হয় তাহলে যথেষ্ট দাস বা কর্মী থাকবে না এবং এটা দ্বিতীয় ধরনের (স্বার্থপর) মানুষদের জন্য জীবনকে আরো কঠিন ও উপভোগ অযোগ্য করে তুলবে।

এর ফলে সমাজ,সম্প্রদায়, দেশ এবং বাকি সকল সিস্টেম ভেঙে পড়বে ( টিকে থাকবে না)।

আর দ্বিতীয় ধরনের লোকেরা এমনটা হওয়ার ভয়েই থাকে।

এইসব স্বার্থপর আকাঙ্ক্ষা থেকেই দ্বিতীয় ধরনের সমাজ সকল কাজ করবে। ফলে সব সময়ই পৃথিবীতে দুর্ভোগ থাকবে।

**দ্রষ্টব্য:** এই দুই ধরনের বাইরে কোনো ধরন থাকতে পারে না কেননা হয় সবার মৌলিকতম অধিকারটি থাকবে অথবা থাকবে না। আর যদি তাদের এই অধিকার না থাকে তাহলে সত্যিকার অর্থেই তাদের কোনো স্বাধীনতা নেই। এর মানে হলো, জীবন সহজাতভাবেই পরাধীনতা এবং বন্দীশালা।

যাই হোক, উপরের তথ্যগুলো কেবল গল্পের একটা দিক। কেননা জীবনের তিনটি মৌলিক আকাঙ্ক্ষা আছে।

সেগুলো হলো-

**১.** স্থায়ীভাবে দুর্ভোগ কমানো, প্রতিরোধ করা বা দুর্ভোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া।

**২.** গভীরতম স্বাধীনতা, শান্তি, ভালোবাসা ও আনন্দ পাওয়া।

**৩.** অস্তিত্বহীন থাকা ( যা সকল সুখ, আনন্দ, পরম আনন্দ ইত্যাদির ঊর্ধ্বে; স্বাধীনতা, শান্তি, ভালোবাসার ঊর্ধ্বে; স্বর্গীয়, ঐশ্বরিক ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে )

**দ্রষ্টব্য:** প্রথম ধরনের মানুষ বা সমাজ চাইবে এই তিন ধরনের মৌলিক অধিকার যেন সবাই পায়।

এই তিন ধরনের মৌলিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটা প্রকৃত সত্য নিহিত আছে যেটা স্পষ্ট হবে যখন একজন লোক জীবন বা অস্তিত্বের সকল বিষয়কে স্বচ্ছতার সাথে এবং সৎভাবে দেখতে পারবে।

- সবকিছু স্বচ্ছতার সাথে বা সৎভাবে দেখার মানে সবকিছুকে নিরপেক্ষ, স্বাভাবিক এবং একেবারে শুরুর অবস্থা থেকে দেখা।

- এমনটা করার মানে- স্বার্থপর আকাঙ্ক্ষা, ভয় এবং বিভ্রান্তির কারণে কোনো বিষয়কে তীর্যক, পক্ষপাতদুষ্ট, বিভ্রান্ত, পরিস্রুত দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখা।

তাই যখন এমনটা করা হয় তখন যে প্রকৃত সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো, এই তিনটি আকাঙ্ক্ষাই প্রকৃতপক্ষে একটি নির্দিষ্ট বিষয় বা উপসংহারকেই নির্দেশ করে।

এর মানে দাঁড়ালো, জীবনের যে ক্ষেত্রে বা যে পর্যায়েই শুরু করেন  না কেনো আপনি যদি গভীরতর সততার সাথে পর্যবেক্ষণ করেন তবে আপনি অনেকগুলো উপসংহার বা উপলব্ধি পাবেন যেগুলো প্রকৃতপক্ষে একটি মৌলিক বিষয় বা উপসংহারকেই নির্দেশ করে।

এমন দুটি উপলব্ধি বা উপসংহারের উদাহরণ হলো -

**(ক)** সবধরনের সমাজ, জীবন, সত্তা শুধুমাত্র (অন্যের) স্বার্থপর উদ্দেশ্যে অস্তিত্বশীল।

**(খ)** আপনি মানুষ বা অন্যান্য অস্তিত্বশীল কিছুর সাথে যত কম আঁকড়ে থাকবেন তত বেশি স্বাধীনতা, শান্তি ও আনন্দ লাভ করবেন।

আর এ দুটো উপলব্ধি বা উপসংহার মূলত একটি মৌলিক উপসংহার বা বিষয়ের দিকেই নির্দেশ করছে আর তা হলো-

জীবনের সবকিছু সকলকে কেবল অস্তিত্বহীনতার দিকে ধাবিত করে।

অস্তিত্বহীনতাই কেবল মানুষের মৌলিক দুটি আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে, কেননা-

**১.** অস্তিত্বহীনতায় কোনো দুর্ভোগ নেই।

**২.** অস্তিত্বহীনতা স্বাধীনতা, শান্তি, ভালোবাসা ইত্যাদির ঊর্ধ্বে।

এর মানে, একমাত্র সত্যিকার স্বাধীনতা বা শান্তি হচ্ছে অস্তিত্বহীনতায়।

অস্তিত্বহীনতা হলো সকল মানুষ, বিষয়, অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও সংবেদনশীলতার ঊর্ধ্বে। এমনকি অস্তিত্বেরও ঊর্ধ্বে।

তাহলে পূর্বে উল্লিখিত 'জীবনের তিনটি মৌলিক আকাঙ্ক্ষা আছে' এর পরিবর্তে আমরা বলতে পারি-

জীবনের একটিমাত্র মৌলিক আকাঙ্ক্ষা আছে আর তা হচ্ছে,

'অস্তিত্বহীনতার' আকাঙ্ক্ষা।

**দ্রষ্টব্য:** যদিও এসকল তথ্যের কিছু অংশ অসংলগ্ন বা অপ্রাসঙ্গিক শোনাতে পারে তবে তা আসলে পুরো প্রাসঙ্গিক। কারণ এটি এমন এক সমস্যা যা প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবনের সকল দুর্ভোগের জন্য দায়ী।

কেননা-

**১.** মানুষ জীবন বা অস্তিত্বে থাকে শুধুমাত্র স্বার্থপরতার কারণে।

এবং

**২.** শিশুকে অস্তিত্বেও আনে শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থে।

এই স্বার্থপরতার কারণেই নতুন শিশু জন্ম দিচ্ছে নিজেদের দাস এবং পুঁজিবাদের দাস করতে।

এই দাসত্বগুলোর সংজ্ঞা নিম্নে দেওয়া হলো-

### (ক) ব্যক্তিগত দাস

ব্যক্তিগত দাস হলো, এমন শিশু বা প্রাপ্তবয়স্ক যাদের কেবল কাজের উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হয় না বরং ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

যেমন- আপনার যদি সঙ্গী থাকে (বন্ধু, জীবনসঙ্গী, সন্তান, পরিবার ইত্যাদি) তবে তারা হবে আপনার ব্যক্তিগত দাস। কারণ আপনি সেই ব্যক্তিকে চালনা বা নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করবেন।

(তাদের থেকে সুখ, ভালোবাসা, অর্থ, বিনোদন, শক্তি, মনোযোগ, সম্মান, যৌন সম্ভোগ, আনন্দ, স্নেহ, ঘনিষ্ঠতা, নিরাপত্তা, স্থিরতা, শান্তি, সন্তান, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি পেতে চাইবেন)

**দ্রষ্টব্য:** লোকেরা সন্তান জন্ম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় (এবং সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, পরিবার ইত্যাদি চায় ) কারণ তারা উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো পাওয়ার আশা করে।

**(খ) কাজের দাস**

আপনি যদি একজন ব্যক্তিকে আপনার কাজ করানোর জন্য ব্যবহার করে থাকেন তবে সেই ব্যক্তিটি আপনার কাজের দাস।

একে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে:

**প্রত্যক্ষ  কাজের দাস**

এবং

**পরোক্ষ কাজের দাস।**

**প্রত্যক্ষ  কাজের দাস** তারা যাদের আপনি সরাসরি ব্যবহার করতে পারবেন অথবা কাজ করাতে পারবেন। এর একটি মৌলিক উদাহরণ হলো- একজন গৃহকর্মী, চাকরিজীবী এবং দাসী। এছাড়াও আরো অনেক উদাহরণ আছে।

যেমন, আপনি আপনার সন্তানদের বাধ্য করেন বড় হয়ে চাকরি করতে বা কাজ করতে (কারণ তারা তখন নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে এসব চাকরি বা কাজ করতে বাধ্য হবে) যাতে তাদের থেকে আপনি লাভবান হতে পারেন।অথচ আপনাকে এসবের জন্য তাদের কিছু মৌলিক চাহিদা পূরণের বাইরে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হচ্ছে না।

**পরোক্ষ কাজের দাস** সেসকল মানুষ বা সত্তা যাদের আপনি জন্ম দেওয়া এবং বাঁচিয়ে রাখার পরম্পরা চালিয়ে যেতে চান কেননা আপনি তাদের পরোক্ষভাবে নিজের কাজে ব্যবহার করতে চান। উদাহরণস্বরূপ- আপনি এমন লোকেদের দিয়েও কাজ করান, যাদের আপনি সরাসরি চেনেনও না।

আপনি আপনার বাড়িতে বিদ্যুৎ এবং জল চান, খাবার চান এবং চান আপনার বাড়ির আবর্জনা কেউ নিয়ে যাক। আপনি অন্য লোকেদের দিয়ে এমন কিছু কাজ করাতে চান যে কাজ আপনি নিজে করবেন না।

যেমন- ডোম, মেথর, বৃদ্ধদের যত্ন নেওয়ার কাজ, জামা-কাপড় বা অন্যান্য জিনিস তৈরির কাজ। এসবের জন্য আপনার পরোক্ষ কাজের দাস প্রয়োজন।

**দ্রষ্টব্য:** পরোক্ষ কাজের দাসদের সম্পর্কে এই তথ্য গল্পের মাত্র অর্ধেক অংশ।

সেই অর্ধেক হলো,

মানুষ চায় ক্রমাগত মানুষের জন্ম হতে থাকুক, যাতে তাদের পরোক্ষ কাজের দাস হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

গল্পের বাকি অর্ধেক হলো,

মানুষ আরো চায়,

> **(ক)** এমন একটি অব্যর্থ সিস্টেম যাতে কেউ চাকরি ছাড়তে না পারে তা নিশ্চিত করা যায়।

**(খ)** তাদেরকে মগজধোলাই করা হোক যাতে তারা বিশ্বাস করে, আত্মহত্যা করা উচিৎ নয়। আর এই মগজধোলাই এতোটা গভীর হবে যে, তারা বুঝতেই পারবে না তাদের মগজধোলাই করা হয়েছে। এমনটা করা জরুরি নয়তো লোকেরা আত্মহত্যা করতে চাইবে। কেননা যদি একজন মানুষ দুর্ভোগ থেকে দীর্ঘস্থায়ী মুক্তি চায় তাহলে সে জীবন থেকেই মুক্তি চাইবে।

**(গ)** একটি অব্যর্থ সিস্টেম যা নিশ্চিত করবে, কেউ যেন সহজে আত্মহত্যা করতে না পারে। যদি মগজধোলাই ব্যর্থ হতে শুরু করে তবে তারা হয়তো আত্মহত্যা করতে চাইবে। কিন্তু অনেকেই এমনটা করতে পারবে না যদি তারা বেদনাহীনভাবে আত্মহত্যার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ বা ঔষধ না পায়। এসব উপকরণ বা ঔষধ পাওয়া যায় না কেননা এসব অবৈধ করে রাখা হয়েছে।

**৩.** মানুষ নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে চায় অন্যরা বেঁচে থাকুক।

এই উদ্দেশ্য হলো, নতুন জন্ম নেওয়া শিশুরা প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাদের ব্যক্তিগত বা কাজের দাস করা।

আর এটা করা তখনই সম্ভব হবে যদি মানুষকে তাদের মৌলিকতম অধিকার (অস্তিত্বহীন থাকার) না দেওয়া হয়।

**দ্রষ্টব্য:** মানুষ যদিও জন্ম দেয় তাদের দাস তৈরির উদ্দেশ্যে কিন্তু মানুষ এই উদ্দেশ্যের নাম দেয়: 'ভালোবাসা', 'যত্ন', 'নৈতিকতা', 'নিঃস্বার্থতা' ইত্যাদি।

প্রায় সকল মানুষই মনে করে, জন্ম দেওয়া গ্রহণযোগ্য বা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। (এমনকি যাদের নিজেদের সন্তান নেই তাদের অনেকেই)

**দ্রষ্টব্য:** মানুষ যদিও বলে, তাদের কাছে অন্যের জীবন গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আসলে তাদের কাছে মূলত যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো -

**১.** তাদের দাসদের বাঁচিয়ে রাখা।

২. তাদেরকে ব্যবহারযোগ্য রাখা।

এজন্য লোকেরা তাদের সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করে তাদের দাসদের বাঁচিয়ে রাখতে যেন তাদের ব্যবহার  করা যায়।

কেননা একজন মৃত দাসের কোনো গুরুত্বই নেই আর একজন অসুস্থ বা  দুর্বল দাসের থেকে আশানুরূপ সেবা পাওয়া যায় না।

আর এগুলো একত্রিত করলে যা দাঁড়ায়-

সবাই জানে, একজন সঙ্গী বা বন্ধু খুঁজে বের করে নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপযুক্ত করে তুলতে কিংবা একটি শিশুকে জন্ম দিয়ে নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপযুক্ত দাস করে তুলতে অনেক অর্থ, শক্তি, সময় এবং চেষ্টার প্রয়োজন হয়।

এজন্য মানুষ চায় এটা নিশ্চিত করতে যে, তাদের ব্যক্তিগত দাসেরা যেন কোনোভাবেই জীবন ত্যাগের অধিকার না পায়।

এই ব্যাপারটা ভেবে দেখা গুরুত্বপূর্ণ,

দুর্ভোগ পৃথিবীতে সবসময়ই থাকবে কেননা মানুষ চায় দুর্ভোগ থাকুক।

কথাটা শুনে আপনার অবাক লাগছে, তাই না ?

মানুষ কেনইবা চাইবে দুর্ভোগ থাকুক?

**যে কারণে মানুষ চায় দুর্ভোগ থাকুক-**

যন্ত্রণা বা দুর্ভোগ হচ্ছে এক প্রকার হাতিয়ার বা কৌশল যা মানুষ তার অধীনস্থ দাসদের নিয়ন্ত্রণ বা মগজধোলাই করতে ব্যবহার করে। যন্ত্রণা বা দুর্ভোগকে পুরষ্কার ও শাস্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

এটা অনেকের কাছে অদ্ভুত মনে হতে পারে, যন্ত্রণা কীভাবে পুরষ্কার হয়!

একটি উদাহরণ দিলে কথাটি স্পষ্ট হবে।

ধরুন, একজন লোককে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিনিয়ত নির্যাতন করা হচ্ছে। কিন্তু কিছু সময় নির্যাতন করা কমালে সেটা অতীতের নির্যাতনের তুলনায় নির্যাতিতের কাছে পুরষ্কার বলেই মনে হবে।

এর মানে দাঁড়ায় অনুভূতি, সংবেদনশীলতা, চেতনা ইত্যাদি কেবল একটি সত্ত্বাকে ব্যবহার বা দাস করে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ।

অর্থাৎ অনুভূতি, সংবেদনশীলতা, চেতনা এসবের উৎপত্তি কেবল অমঙ্গলকর উদ্দেশ্যে।

যদিও অনেক লোক সবাইকে এটা বিশ্বাস করাতে চায় যে, অনুভূতি, চেতনা, স্মৃতি ইত্যাদি চমৎকার বা স্বর্গীয় ব্যাপার কিন্তু প্রকৃত অর্থে এগুলো নিষ্ঠুর এবং ক্ষতিকর। কেননা, এগুলো না চাওয়ারও কোনো অপশন ছিলো না।

যদি আপনি অনুভূতি, চেতনা, স্মৃতি এসব থেকে নিশ্চিত বা স্থায়ী মুক্তি না পান তবে এগুলো আপনাকে বন্দী ও নির্যাতন করার হাতিয়ার হয়ে থাকবে।

আর এই চেতনা, স্মৃতি, অনুভূতিই হলো অস্তিত্ব।

তাই অস্তিত্বও আপনাকে বন্দী, দাস, নির্যাতন করার একটি হাতিয়ার বা কৌশল। তাই অস্তিত্ব আপনাকে সবসময় দুর্ভোগ দিবে।

অর্থাৎ দুর্ভোগ কমাতে বা প্রতিরোধ করতে অস্তিত্ব বিলীন করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই।

অনুভূতি, সংবেদনশীলতা, চেতনা ইত্যাদি অমঙ্গলকর। কেননা যদি কোনো কিছু মঙ্গলকর উদ্দেশ্যে করা হতো তাহলে তা হতো মানুষ বা সত্তা যেন কোনো যন্ত্রণা বা দুর্ভোগ না ভোগ করে সে উদ্দেশ্যে।

আর দুর্ভোগ বা যন্ত্রণা থাকে না একমাত্র অস্তিত্বহীনতায়। তাই আপনি যদি মঙ্গলকর হন তবে যা একমাত্র সৃষ্টি করতে পারেন তা হলো অস্তিত্বহীনতা। কিন্তু কোনো কিছু সৃষ্টি বা অস্তিত্বশীল না করাই তো অস্তিত্বহীনতা।

এজন্য আপনি যদি মঙ্গলকর হন তবে আপনি সহজাতভাবেই -

**১.** কোনো অস্তিত্বকে সৃষ্টি করবেন না।

**২.** কোনো অস্তিত্বকে দীর্ঘস্থায়ী করবেন না।

**৩.** সমস্ত অস্তিত্বকে তাৎক্ষণিক, বেদনাহীন উপায়ে বিলীন করে দিবেন।

আর যা কিছু এই তিনটি কাজের বাইরে তা-ই অমঙ্গলকর।

**দ্রষ্টব্য:** যদি কেউ এমনটা ভেবে উদ্বিগ্ন হয় যে, তাহলে তো যা কিছু অস্তিত্বশীল সবই অমঙ্গলকর।

তবে আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, যদি আপনি জীবন বা অস্তিত্বের সবকিছুকে স্বচ্ছভাবে বা সৎভাবে দেখেন তবে বুঝবেন :

'অস্তিত্বশীল সবকিছুই অমঙ্গলকর'।

কারণ তা যদি মঙ্গলকরই হতো,

তাহলে দুর্ভোগ বলে কিছু থাকতোই না"

---

সকল ধরনের জ্ঞান বা আলোকপ্রাপ্তিই বৃথা ও অমঙ্গলকর যদি তা সবার দুর্ভোগ দূর না করে। প্রকৃত আলোকপ্রাপ্তি তখনই ঘটবে যখন সকল অস্তিত্ব অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে।

**দ্রষ্টব্য:** প্রকৃত আলোকপ্রাপ্তি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নেই, কেননা প্রকৃত আলোকপ্রাপ্তি স্পষ্টভাবেই অস্তিত্বহীনতার দিকে নিয়ে যায়।

আর অস্তিত্বহীনতায় -

- কোনো শিক্ষা নেই
- কোনো শিক্ষক বা গুরু নেই
- কোনো ছাত্র, শিষ্য, অনুসারী নেই
- কোনো বিশেষ স্থান (যেমন- আশ্রম) নেই
- কোনো নিয়ম-নীতি অথবা ধর্মমত নেই
- কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নেই
- কোনো আলোকপ্রাপ্তি বা আত্মোপলব্ধি নেই
- পরজগৎ নেই
- ঈশ্বর নেই
- অস্তিত্ব নেই

ইত্যাদি।

তাই আলোকপ্রাপ্তি শব্দটি ব্যবহার করাই হাস্যকর।

যদি এই সকল বিষয় বুঝতে পারেন তবে আপনি উপলব্ধি করবেন, যাকে লোকে আলোকপ্রাপ্তি, আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম, ঈশ্বর ইত্যাদি বলে সেগুলো আসলে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার অস্ত্র বা কৌশল ছাড়া কিছুই নয়।

**দ্রষ্টব্য:** এই সকল কিছুই দুর্ভোগ সৃষ্টি করে কিন্তু এসবের জন্য দায়ী মানুষ। কেননা তারাই তাদের অধীনস্থদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রতিনিয়ত এসব ধর্ম, প্রতিষ্ঠান, দল, সংস্থা, সিস্টেম ইত্যাদি তৈরি করছে।

এগুলো দুর্ভোগ তৈরি করা সত্ত্বেও মানুষ এগুলোকে টিকিয়ে রাখতে চায় অন্যদের শোষণ বা নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য।

এগুলোই তাদের একমাত্র হাতিয়ার নয় আরো অনেক হাতিয়ার রয়েছে।

যেমন- আইন, বিশ্বাস, সিস্টেম, নিয়ম ইত্যাদি যা জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।

এই বিষয়টি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে,

মানুষ অন্য মানুষদেরকে ব্যবহার বা অধীনস্থ করে রাখতে এগুলো তৈরি করেছে।

এগুলো জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এই তথ্যগুলো যদি কেউ মগজধোলাই থেকে বের হয়ে আসতে ব্যবহার করে তাহলে এটা তাদেরকে গভীরতর পর্যায়ে নিয়ে যাবে, আর তা হলো অস্তিত্বহীনতা।

এর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক-

আপনার জীবনের বন্দিত্ব, দাসত্ব, নির্যাতন, নিপীড়ন এসব যদি কমাতে চান তাহলে প্রথমেই আপনাকে বুঝতে হবে, এগুলো আপনার জীবনে বিদ্যমান। আর এটাই মগজধোলাই থেকে বের হয়ে আসার প্রাথমিক পর্যায়, যা আপনাকে গভীরতর পর্যায়ে নিয়ে যাবে।

এটাকে আরো স্পষ্ট করার জন্য বলা যায়-

বন্দিত্ব, দাসত্ব, নির্যাতন, নিপীড়ন এগুলোই আপনার জীবন বা অস্তিত্ব।

তাহলে এটা স্পষ্ট যে, এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে অস্তিত্বের সমাপ্তি। তখন যা অবশিষ্ট থাকবে তা হলো অস্তিত্বহীনতা।

যাইহোক, এবার ব্যাপারটাকে আবার ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে আসা যাক।

এটা উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ যে, জীবনের যেকোনো সমস্যার সমাধানের জন্য আপনাকে সবকিছু পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কেননা জীবনে অনেক বিষয় বা দিক আছে যেগুলো একটা অপরটার সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। তাই যদি আপনি আপনার জীবনের কোনো একটা দিকেরও সামান্যতম পরিবর্তন আনেন তবে অন্য দিকগুলোও প্রভাবিত হবে।

এজন্য আপনি যদি জীবনের সমস্যাগুলোর সমাধান করতে চান তাহলে কেবল একটি দিকের সমাধান করতে পারবেন না।

কেননা এতে একটি দিকের সমাধান হবে ঠিকই তবে অন্য দিকগুলোতে সমস্যা তৈরি হবে।

ফলে আপনাকে হয় জীবনের সব দিকের সমাধান খুঁজতে হবে নতুবা কোনো দিকের সমস্যারই সমাধান হবে না।

একদিকের সমস্যার সমাধান করতে গেলে সমস্যা বা দুর্ভোগ কেবল বাড়বেই।

দুর্ভোগ কমাতে, প্রতিরোধ বা নির্মূল করতে আপনাকে জীবনের সমস্যাগুলোর গভীরতর পর্যায় পর্যন্ত বিশ্লেষণ করতে হবে।

সমস্যার যদি ১০০ টি পর্যায় থাকে আর আপনি যদি ৯৯ টি পর্যায়ও বিশ্লেষণ করেন তবে আপনার বিশ্লেষণ সঠিক নাও হতে পারে। এর একটি ভালো উদাহরণ দেখা যেতে পারে দুর্ভোগের ক্ষেত্রে।

- আপনাকে যদি এমনভাবে মগজধোলাই করা হয়ে যেন আপনার মনে হয় 'দুর্ভোগ দরকারি এবং গ্রহণযোগ্য' তাহলে যখন আপনার কোনো কাজের জন্য আপনাকে ভুগতে হয় তখনও আপনি মনে করবেন 'দুর্ভোগ দরকারি এবং গ্রহণযোগ্য'।

এর ফলে আপনি এমন কাজ বারবার করবেন এবং দুর্ভোগ পোহাবেন।

এটা ততক্ষণ ঘটতেই থাকবে যতক্ষণ না আপনি আপনার মগজধোলাই থেকে বের হয়ে আসবেন।

আপনি যদি জীবনের মৌলিক ইস্যুগুলোকে বিশ্লেষণ করেন তবুও অন্য সকল (ছোটখাটো) ইস্যুগুলো বিশ্লেষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। বেশিরভাগ মানুষই এমনটা করে না। তাই পরিপূর্ণ ধারণা না থাকায় তাদের জ্ঞান হয়ে পড়ে অর্থহীন। ফলে দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়।

বেশিরভাগ লোকই কৌশল হিসেবে সকল পর্যায় পরীক্ষা করতে চায় না। তারা কিছু পর্যায় ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যায়, তারা যে স্বার্থপর, অনৈতিক এবং নিষ্ঠুর পাছে যেন নিজের কাছেই প্রকাশ হয়ে না যায়।

কেউ যদি নিজেকে স্বার্থপর বা অনৈতিক  হিসেবে প্রকাশ করেই ফেলে তখন সেটাকে গভীর কিছুর আড়ালে লুকোতে চায়।

যেমন- অনেকে তাদের অনৈতিক কাজকে বৈধতা দিতে বলে যে, "ভালো-মন্দ, সঠিক-বেঠিক, নৈতিক-অনৈতিক বলে কিছু হয় না।"

আপনি যখন সকল কিছুর শুরু কোথায় (সেটা আসলে অস্তিত্ব)  বুঝতে পারবেন তখন এই লোকেরা আর এসব কৌশল ব্যবহার করে এড়িয়ে যেতে পারবে না।

আপনিও পারবেন না, কেউই পারবে না।

যখন লোকেরা এইসব কৌশলে রেহাই পায় না তখন তারা অন্য কৌশল (উপহাস করা, লজ্জা দেওয়া) অবলম্বন করে।জীবনের সকল ক্ষেত্রে (সম্পর্ক, বন্ধুত্ব বা পরিবার) এটা সাধারণ একটি ব্যাপার ।

**দ্রষ্টব্য:** যেহেতু মানুষ প্রতিনিয়ত নৈতিকতা বিবর্জিত হচ্ছে (অন্যদেরকে ব্যবহার বা দাস করার মাধ্যমে), এর মানে হলো আপনার মগজধোলাই করার জন্য তারা প্রতিনিয়ত এসকল কথা বলতেই থাকবে যতক্ষণ না আপনাকে বিশ্বাস করাতে পারবে যে, অনৈতিক কাজগুলো নৈতিক এবং গ্রহণযোগ্য।

যদি আপনি বুঝতে পারেন তারা যা করছে সেগুলো অনৈতিক তাহলে আপনাকে এটা উপলব্ধি করা প্রয়োজন, এসব অনৈতিক  কাজ কখনোই থামবে না।

ফলে তারা আপনাকে এটা বিশ্বাস করানোর চেষ্টা চালিয়েই যাবে যে, মানুষকে ব্যবহার করা বা দাস করা নৈতিক এবং গ্রহণযোগ্য। অন্যথায় তারা তাদের অধীনস্থদের যে দুর্ভোগ সৃষ্টি করছে তার জন্য দোষী অনুভব করা শুরু করবে।

যেহেতু এটা সবসময় চলতেই থাকবে তাই আপনি যদি আপনার জীবনের দুর্ভোগ কমাতে বা প্রতিরোধ করতে চান তবে আপনাকে যেটা মাথায় রাখতে হবে তা হলো- যখনই কেউ আপনার মগজধোলাই করার চেষ্টা করবে তখনই এটাকে একটি সতর্ক সংকেত হিসেবে নিবেন এবং তাদের সাথে সেই মুহূর্ত থেকে সম্পর্ক ও যোগাযোগ চিরতরে ছিন্ন করবেন।

**পাশ-দ্রষ্টব্য:** আপনাকে তাদের সাথে যোগাযোগ বা সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে কোনো কৈফিয়ত বা ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

যদি তারা কোনো জবাব বা ব্যাখ্যা চায় এবং আপনাকে অন্তত একটি বাক্য বলতেই হয় তাহলে বলবেন,

আপনারা জবাব পাবেন যদি নিজেদের জীবনের পরিস্থিতিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন।

**দ্রষ্টব্য:** অনেকেই বলার চেষ্টা করবে এবং নানাভাবে যুক্তি দেখাবে যে-

**১.** আমি মানুষকে আমার ব্যক্তিগত বা কাজের দাস হিসেবে ব্যবহার করছি না।

**২.** আমি মানুষকে স্বাধীনতা দিই।

**৩.** জীবন বন্দীশালা নয়।

**৪.** জীবনে কেবল ৯৯% দুর্ভোগই নয়, এতে ১% হলেও সুখ বা শান্তি আছে।

...ইত্যাদি।

মূল কথা হলো, এসবের কোনোটি নিয়েই আলোচনার প্রয়োজন নেই কেননা এসব কেবল কথার কথা, অজুহাত।

সহজভাবে দেখতে গেলে,

যদি কোনো লোক এসব বিবৃতি (উপরের চারটি) বিশ্বাস করে তাহলে তাদের এসব প্রমাণ করতে কোনো সমস্যা হবে না যদি তারা মানুষকে দয়া করে দুটি সুবিধা দিতে পারে-

**১.** এমন একটি ভবন যেখানে যেকেউ  যেতে পারবে এবং গিয়ে তাৎক্ষণিক ও বেদনাহীনভাবে জীবন ত্যাগের সুবিধা পাবে।

**২.** এমন একটি সেবা যার মাধ্যমে যেকেউ কোনো একজনকে তার ঘরে ডাকতে পারবে যেন তাৎক্ষণিক, বেদনাহীনভাবে জীবন ত্যাগের সুবিধা পায়।

আর এই সেবা বা ভবন থেকে মানুষ এমন একটা পদ্ধতিকে বাছাই করতে পারবে যা হবে গভীরতর ঘুমে বেদনাহীনভাবে জীবনত্যাগ।

আসল কথা হলো, আলোচনা বা বিতর্কের আর অবকাশ নেই। কেননা বেদনাহীন বিদায়ের স্বাধীনতা হয় আছে , না হয় নেই।

বস্তুত আপনি হয় (ক) ধরনের অথবা (খ) ধরনের ব্যক্তি।

আপনি কোন ধরনের তা বোঝার জন্য বিশাল আলোচনার প্রয়োজন নেই। কারণ একটি সহজ পর্যবেক্ষণ থেকেই এটা প্রকাশ পাবে।

তা হচ্ছে-

- আপনি অন্যদের ব্যক্তিগত-দাস হিসেবে ব্যবহার করেন অথবা করেন না।
- এই সেবা বা ভবনের অস্তিত্ব আছে অথবা নেই।
- বাচ্চাদের অস্তিত্বে আনছেন অথবা আনছেন না।
- আপনি বিভিন্ন নিয়ম, বিশ্বাস, সিস্টেম তৈরির মাধ্যমে লোকেদের ফাঁদে ফেলছেন, বন্দী করছেন, দাসত্ব করাচ্ছেন, নির্যাতন-নিপীড়ন করছেন অথবা করছেন না।

...ইত্যাদি।

**দ্রষ্টব্য:** এটি উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই পর্যবেক্ষণের জন্য বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন নেই কিংবা কারো উপর নির্ভর করারও প্রয়োজন নেই। এর মানে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই এটি করতে পারবে।

অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তি যাচাই করতে পারে যে, এই সেবা বা ভবনটির অস্তিত্ব তাদের জন্য আছে কিনা এবং তাদের সেখানে প্রবেশাধিকার আছে কিনা।

প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি ব্যক্তির এই সেবা পাওয়ার বা ভবনে প্রবেশাধিকার থাকা অত্যাবশ্যক। একজন ব্যক্তি বা সত্ত্বাও যেন বাদ না পড়ে। সেজন্য এই সেবা বা

ভবনকে সীমাবদ্ধতামুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ , প্রবেশাধিকার সীমাবদ্ধ করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই (যেমন- বয়স, শ্রেণী, লিঙ্গ, জাতি, ইত্যাদি ভেদে)।

আপনি কেবল এই সেবা বা ভবনটিতে প্রবেশ করবেন এবং দুর্ভোগের এই জীবন থেকে তাৎক্ষণিক মুক্তি পাবেন। এর সবই ঘটবে বেদনাহীন উপায়ে।

**পাশ-দ্রষ্টব্য:** যারা বলে 'প্রত্যেকের স্বাধীনতা আছে যখন খুশি আত্মহত্যা করার' তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, স্বার্থপর এবং নৈতিকতা বিবর্জিত।

কারণ -

**১.** আত্মহত্যার এমন কোনো পদ্ধতি নেই যা তাৎক্ষণিক, বেদনাহীন, নিশ্চিত মৃত্যু প্রদান করে। এখানে শেষ শব্দ 'নিশ্চিত' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

কারণ আত্মহত্যার সমস্ত পদ্ধতিই দুর্ঘটনাক্রমে ব্যর্থ হতে পারে এবং এর ফলে আপনাকে আবারো এই জঘন্য জীবনে আগের থেকেও বেশি দুর্ভোগ নিয়ে থাকতে হবে।

**২.** অনেক মানুষ শুধুমাত্র জীবন ছেড়ে যেতে চায়, যখন-

**ক)** তাদের মাথায় কোনো নেতিবাচক চিন্তা থাকে না

এবং

**খ)** তাদের শরীরে নেতিবাচক আবেগও থাকে না।

মানুষ কেন এমনটা চাইবে তার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। এর মানে, তারা শুধুমাত্র জীবন ছেড়ে যেতে চায় যখন তাদের কাছে গভীরতম ঘুমে তাৎক্ষণিক বা বেদনাহীন মৃত্যুর পদ্ধতি আছে।

বেশিরভাগ মানুষের জন্য এইভাবে মৃত্যুর উপায় বের করা একটি কঠিন বিষয়, যেহেতু এমনটা করার জন্য প্রয়োজনীয় অনেক সরঞ্জাম অবৈধ। আর যদি লোকেরা একে

অপরকে এতে সাহায্য করে, তবে এই কাজটি নৈতিক (যেহেতু এটি যন্ত্রণার অবসান ঘটায়) এবং সম্মতিমূলক হওয়া সত্ত্বেও তা আইনের চোখে অবৈধ।

মূল বিষয় হলো, বেশিরভাগ মানুষই কোনো অবৈধ কাজ করতে চায় না, কারণ এর ফলে তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হতে পারে যা পরিস্থিতি এবং জীবনকে আরো বেশি দুর্বিষহ করে তুলবে।

**৩.** অনেক মানুষ আত্মহত্যা করতে চাইবে না, কারণ তাদের জন্ম থেকেই হাজার হাজার নিয়ম, বিশ্বাস, সিস্টেম দ্বারা গভীরভাবে মগজধোলাই করা হয়েছে।

এমন বিশ্বাস বা ধারণা গেঁথে দেওয়া হয়েছে যে "জীবন ভালো, মৃত্যু খারাপ"।

তারা নিজেদের মস্তিষ্ক থেকে অনেক ধারণাই মুছে ফেলতে পারে কিন্তু তারা এই বিশ্বাসটি থেকে কোনোভাবেই বের হতে পারে না, কারণ তারা জানে না যে এটি তাদের মধ্যে পরোক্ষভাবে আগে থেকেই গেঁথে দেওয়া হয়েছিল।

**দ্রষ্টব্য:** এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই সকল মগজধোলাই করা হয় যাতে করে সম্পূর্ণরূপে তাদের ব্যবহার করা যায়।

এইসব কতটা স্বার্থপর, অনৈতিক এবং নিষ্ঠুর তার মাত্রা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠবে, যখন এই বিষয়গুলো গভীরতর সততার সাথে পরীক্ষা করা হবে।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য:** এর আগে আমি বিষয়টি উল্লেখ করেছি যে, জীবন ৯৯% কষ্টের ও ১% সুখ-শান্তির সামান্য ছিটেফোঁটার সমষ্টি। এটি সত্য মনে হবে যদি আপনি জীবনের সমস্ত কষ্টকে গণনায় ধরে গভীরতর সততার সাথে জীবনকে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

জীবনের সমস্ত জিনিস কেবল অস্তিত্বহীনতার দিকেই নির্দেশ করে। অস্তিত্বহীনতাই কেবল জীবনের আশ্চর্যজনক মুহূর্তগুলোকে (স্বর্গীয় আনন্দ, পরম আনন্দ, প্রকৃত সুখ ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত করে।

**দ্রষ্টব্য:** আপনি যদি আপনার জীবনের সকল দুর্ভোগ থেকে স্থায়ীভাবে মুক্তি চান তাহলে আপনাকে এই ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে হবে, জীবন বা অস্তিত্বে সমাধান নেই বরং জীবন বা অস্তিত্ব থেকে মুক্তিলাভেই সমাধান।

আপনি যেখান থেকেই শুরু করেন না কেনো সমাধান বা উপসংহার একই রকম থাকবে। এই সমাধান বা উপসংহারকে একটু ভিন্নভাবে দেখা যাক-

মানুষ স্বাধীন নয় কেননা তাদের যখন খুশি জীবন থেকে তাৎক্ষণিক বা বেদনাহীন মুক্তিলাভের উপায় নেই।

আর এই উপায় না থাকার কারণ হলো,

সবাই চায় অন্য সবাইকে নিজেদের অধীনস্থ করে রাখতে।

এর মানে জীবন সহজাতভাবেই 'বন্দীশালা'।

অর্থাৎ , জীবন সহজাতভাবেই 'দুর্ভোগ'।

জীবনকে সৎভাবে পর্যবেক্ষণ করলে উপরের কথাগুলোর সত্যতা দেখতে পাবেন। যেভাবেই আপনি পর্যবেক্ষণ করেন না কেনো ফলাফল একই আসবে।

আর তা হলো, 'জীবন মানেই দুর্ভোগ'।

আপনি যদি সৎভাবে জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেন তবে দেখবেন, কীভাবে জীবনের সবচেয়ে চমৎকার বিষয়গুলোও দুর্ভোগের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত।

তাই উপরের কথাগুলো থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে,

যেহেতু 'দুর্ভোগ অপ্রয়োজনীয় এবং অগ্রহণযোগ্য'

আর জীবন মানেই 'দুর্ভোগ'

এর মানে দাঁড়ায়,

''জীবন অপ্রয়োজনীয় ও অগ্রহণযোগ্য।'

অর্থাৎ অস্তিত্বও অপ্রয়োজনীয় ও অগ্রহণযোগ্য।

জীবনের সকল সমস্যা এবং দুর্ভোগের সমাধান হচ্ছে সবার প্রত্যাশিত দীর্ঘস্থায়ী স্বাধীনতা অর্থাৎ অস্তিত্বহীনতা।

পূর্বে উল্লিখিত প্রথম ধরনের (নৈতিক) সমাজের লোকেরা আসলে নৈতিক হওয়ার চেষ্টা করে না, তারা কেবল চায় কাউকে যেন দুর্ভোগ পোহাতে না হয়।

প্রকৃত সত্য হচ্ছে,

'একটা সমাজ তখনই শতভাগ নৈতিক হতে পারে যখন সে সমাজের অস্তিত্ব না থাকে'।

যদি কোনো সমাজ ৯০%ও নৈতিক হয় তবুও তারা ভোগান্তি পোহাবে (কেননা তখনও ১০% অনৈতিকতা থাকবে) এবং স্বাভাবিকভাবেই তারা তখন সকল লোকের দুর্ভোগ কমানোর জন্য গভীরতর পদ্ধতি অনুসন্ধান করবে।

**দ্রষ্টব্য:** পূর্বের কথার প্রেক্ষিতে বলা যায়,

একটা সমাজ তখনই বাসের যোগ্য যখন এর অস্তিত্ব না থাকে!

উপরের যুক্তি যদি আমরা অস্তিত্বের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি তাহলে বলা যায়,

অস্তিত্ব তখনই শতভাগ নৈতিক যখন তা অস্তিত্বহীন!

অর্থাৎ যা একমাত্র থাকার যোগ্য তা হলো অস্তিত্বহীনতা।

এটা শুনতে কারো কারো কাছে অদ্ভুত শোনাতে পারে যে,

অস্তিত্ব তাৎক্ষণিক বা বেদনাহীনভাবে শেষ হতে পারে।

কিন্তু এর বাস্তব সম্ভাবনা আছে (কারণ যা কিছু সৃষ্টি করা যায় তার সমাপ্তিও আছে)।

অস্তিত্ব যেভাবেই সৃষ্টি হোক না কেনো এটা সবক্ষেত্রেই সত্য।

**দ্রষ্টব্য:** হয়তো অল্পকিছু মানুষ বা সত্ত্বারই কেবল তাৎক্ষণিক বা বেদনাহীনভাবে অস্তিত্ব শেষ করে দেওয়ার সামর্থ আছে।সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপারটি বুঝতে হবে তা হলো, জীবন বা অস্তিত্ব শেষ হতে পারে কেননা এটা বিদ্যমান আছে।

জীবন বা অস্তিত্ব সহজাতভাবেই শেষ হবে কেননা কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। তাই মূল ব্যাপারটা এটা নয় যে, অস্তিত্ব শেষ হবে কিনা বরং কখন শেষ হবে এটাই মূল ব্যাপার।

আমাদের মনে রাখতে হবে, যখন আমরা কোনো সিস্টেমের কথা বলি এটা সুনিশ্চিত যে, সকল সিস্টেমই সহজাতভাবে দুর্ভোগ সৃষ্টি করবে।

তাই কোনো সিস্টেম যত দীর্ঘস্থায়ী হবে দুর্ভোগও তত দীর্ঘস্থায়ী হবে।

আর যেহেতু জীবন বা অস্তিত্ব একটা সিস্টেম সেহেতু এর মানে, জীবন বা অস্তিত্ব যত দীর্ঘ সময় টিকে থাকবে দুর্ভোগও তত দীর্ঘস্থায়ী হবে।

একটি সিস্টেম ধ্বংস হতে কতটা সময় লাগবে তা কিছু বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

এর একটি ভালো উদাহরণ হতে পারে-

একটি ভবন ধ্বংস হবে না যদি মানুষ প্রতিনিয়ত যত্ন করে সেটাকে টিকিয়ে রাখে।

তেমনি একটি সিস্টেম কখনো ধ্বংস হবে না যদি মানুষ সেটাকে যত্ন করে টিকিয়ে রাখতে চায়।

আরো গভীরভাবে বলতে গেলে,

অস্তিত্ব ধ্বংস হবে না যদি মানুষ প্রতিনিয়ত অস্তিত্বের যত্ন করে।

এর মানে হলো, দুর্ভোগ কখনো শেষ হবে না যদি মানুষ দুর্ভোগকে টিকিয়ে রাখে।

সবাইকে এটা উপলব্ধি করতে বা বুঝতে হবে যে,

**১.** জীবন বা অস্তিত্ব কেবল একটা সিস্টেম।

**২.** সকল সিস্টেমই দুর্ভোগ সৃষ্টি করে।

**৩.** সকল দুর্ভোগ শেষ হওয়ার একমাত্র স্থায়ী উপায় হচ্ছে সকল সিস্টেমের তাৎক্ষণিক বা বেদনাহীন সমাপ্তি।

তাহলে

৪. সকল দুর্ভোগের চূড়ান্ত সমাধান হচ্ছে অস্তিত্বের তাৎক্ষণিক বা বেদনাহীন সমাপ্তি কেননা এরপর যা অবশিষ্ট থাকে তা হচ্ছে 'অস্তিত্বহীনতা'; সবাই আসলে যা চায়।

আর এটা তখনই দ্রুত ঘটবে যদি মানুষ মূল ব্যাপারগুলো বুঝতে পারে।

আর মূল ব্যাপারগুলো হলো-

- জীবন বা অস্তিত্ব হচ্ছে বন্দীশালা,

- জীবন বা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা চরমতম বোকামি,

- দুর্ভোগ অপ্রয়োজনীয় ও অগ্রহণযোগ্য,

- মানুষকে ব্যবহার বা দাস করা অপ্রয়োজনীয় ও অগ্রহণযোগ্য।

...ইত্যাদি।

এটা উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ যে, (অস্তিত্ব, দুর্ভোগ) এসবের সমাপ্তি স্বাভাবিকভাবেই ঘটবে যদি কেবল মানুষ নিজেদের এবং অন্যদের মিথ্যা বলা, মগজধোলাই করা, বিভ্রান্ত করা বন্ধ করে।

এর মানে আপনার উচিৎ স্বার্থপরতা, বোকামি, অনৈতিকতা বন্ধ করা। কেননা এগুলো আপনাকে এবং অন্যদেরকে দুর্ভোগ দেয় এবং দুর্ভোগকে দীর্ঘস্থায়ী করে।

**দ্রষ্টব্য:** একটা যুক্তি দেখানো হয় যে, যদি সকল মানুষ বা সত্তা আসলেই অস্তিত্বহীনতা চায় তাহলে কিছুই করার দরকার নেই।

কিন্তু কিছুই না করলে অস্তিত্বের যন্ত্রণায় ভুগতে হবে। আসলে এটা নির্ভর করে মানুষ বা সমাজ কতটা ভুগতে চায় তার উপর।

মানুষ বা সমাজ কতটা ভুগতে চায় তাকে তিনটি বিকল্পে ভাগ করা যেতে পারে-

**বিকল্প-১:**

চরম এবং দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভোগে তারাই থাকবে যারা অস্তিত্বহীনতার বিপরীত দিকে যাবে।

বিপরীত দিকে যাওয়া বলতে বুঝানো হচ্ছে, মানুষ বা সমাজ স্বার্থপর, অনৈতিক ও খারাপ হওয়ার পথ বেছে নিচ্ছে যা তাদের জন্য চরম ও দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভোগ ডেকে আনবে।

আর এটা ততক্ষণ ঘটতে থাকবে যতক্ষণ না দুর্ভোগ এত তীব্র হয় যে তারা থামতে এবং জীবনের সবকিছু গভীরভাবে পুনরায় ভেবে দেখতে বাধ্য হয়।

যদি তারা জীবনের সকল দিক গভীর সততার সাথে ভেবে না দেখে তবে তাদেরকে আরো ভুগতে হবে যে পর্যন্ত না তারা উপলব্ধি করে দুর্ভোগের চূড়ান্ত সমাধান 'অস্তিত্বহীনতা'। তখন তারা যা করবে তা তাদের এবং সবার ভালোর জন্য, যেখানে তাদের আগের পথটি ছিলো স্বার্থপর ও অনৈতিকভাবে বেঁচে থাকার এবং অন্যদের ব্যবহার ও দাস করে রাখার।

**বিকল্প-২:**

স্বল্পস্থায়ী দুর্ভোগে সেসকল মানুষ বা সমাজ থাকবে যারা অস্তিত্বহীনতার দিকে যাবে।

এই মানুষ বা সমাজ স্বাভাবিকভাবে নৈতিক। কেননা তারা চায় অন্যরা ভোগান্তিতে না থাকুক।

আর এজন্য-

**(ক)** তারা স্বাভাবিকভাবেই চায় না কোনো শিশু বা সত্ত্বাকে অস্তিত্বে আনতে।

**(খ)** তারা স্বাভাবিকভাবেই চায় যেন সকল মানুষ জীবন বা অস্তিত্ব ত্যাগের তাৎক্ষণিক ও বেদনাহীন পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা পায়।

**(গ)** তারা চায় যেকোনো মানুষ বা সত্ত্বাকে মগজধোলাই থেকে বের হয়ে আসতে সাহায্য করতে।

আর স্বভাবতই এমন মানুষ বা সমাজ কাউকে মগজধোলাই করবে না।

**দ্রষ্টব্য:** মানুষ মগজধোলাই থেকে এমনিতেই বের হয়ে আসবে (কারো সাহায্য ছাড়া) যদি তাদের প্রতিনিয়ত মগজধোলাই করা বন্ধ করা হয়।

আসলে মানুষ যখন দুর্ভোগে থাকে তখন সে স্বাভাবিকভাবেই দুর্ভোগের কারণ খুঁজে বের করতে চায়। কিন্তু স্বার্থপর বা অনৈতিক  সমাজে মানুষকে প্রতিনিয়ত মগজধোলাই করে বিশ্বাস করানো হয় "দুর্ভোগ গ্রহণযোগ্য এবং প্রয়োজনীয়"। আর এর ফলে দুর্ভোগের চক্রের পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকে।

এর একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে-

যখন আপনার হাত গরম চুলায় পুড়ে যায় তখন আপনি হাত সরিয়ে নেন। কিন্তু আপনাকে যদি মগজধোলাই করা হয়, 'যে যন্ত্রণা তুমি পেয়েছ তা তোমাকে মেনে নিতে হবে' কেননা  'এটা জীবনের একটি অংশ', 'তোমাকে শক্ত হতে হবে', 'তোমাকে চেষ্টা করে সফল হতে হবে' ইত্যাদি তবে আপনি আবার গরম চুলায় হাত দিবেন। আর এভাবেই যন্ত্রণার চক্রের পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকবে।

**বিকল্প-৩:**

কোনো দুর্ভোগ থাকবে না যদি সকল মানুষ বা সমাজ তৎক্ষণাৎ অস্তিত্বহীন হতে পারে।

এই ধরনের লোকেরা জানে যে,

বিকল্প-১ বোকামি কেননা এতে নিজেই নিজের দুর্ভোগ ডেকে আনা হয়।

তারা এটাও জানে যে, বিকল্প-২ ভালো তবে এটাও কিছুটা বোকামির কেননা যখন আপনি জানেন যে চূড়ান্ত  সমাধান 'অস্তিত্বহীনতা' তাহলে সেখানে কালক্ষেপণ কেন ?

আর এজন্য এই ধরনের মানুষ বা সমাজ চেষ্টা করবে তাৎক্ষণিক, বেদনাহীন, নিশ্চিত উপায়ে অস্তিত্বহীন হতে।

**দ্রষ্টব্য:** এটা উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ যে,

যদিও মানুষ বিশ্বাস করে বিকল্প-৩ খুবই কঠিন অথবা অসম্ভব কিন্তু বিকল্প-২ না করার কোনো অজুহাত থাকতে পারে না।

কেননা বিকল্প-২ এর (ক), (খ), (গ) যেকোন মানুষ বা সমাজের দ্বারাই সম্ভব।

কারণ এগুলো করতে এমন কোনো দক্ষতার বা প্রযুক্তির প্রয়োজন নেই যা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি।

অর্থাৎ এগুলো ঠিক এখনই করা সম্ভব।

তাই কোনো মানুষ বা সমাজের অনৈতিক  আচরণকে বৈধতা দেওয়ার কোনো অজুহাত থাকতে পারে না।

**দ্রষ্টব্য:** এটা বলা যেতো যে, এই বইয়ের উপসংহার বা মূলকথা হচ্ছে, সবাইকে একটি বিকল্প বেছে নিতে হবে।

(যে বিকল্প আপনার জীবন কতটুকু দুর্ভোগ পোহাবে এবং কতটুকু শান্তি, স্বাধীনতা, ভালোবাসা পাবে সব নির্ধারণ করে দিবে)

আপনাকে বাছাই করতে হবে দুটি বিকল্প থেকে-

**বিকল্প-ক:**

আপনি এটা মেনে নিবেন যে, 'দুর্ভোগ গ্রহণযোগ্য'।

এবং

**বিকল্প-খ:**

আপনি এটা মেনে নিবেন যে, 'দুর্ভোগ গ্রহণযোগ্য নয়'।

ব্যাস এটুকুই যথেষ্ট। এর বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই। কেননা যেকোনো একটি বিকল্প বেছে নিলে সবকিছুই সে অনুসারে ঘটতে থাকবে।

যদি কোনো মানুষ বা সমাজ বিকল্প-ক বেছে নেয় তাহলে তারা নিজেদের ও অন্যদের জন্য অবশ্যই দুর্ভোগ ডেকে আনবে কেননা তারা বিশ্বাস করে 'দুর্ভোগ গ্রহণযোগ্য'।

**দ্রষ্টব্য:** তারা দুর্ভোগে থাকলেও তাদের অভিযোগ করার অধিকার থাকবে না, কেননা তারা মেনে নিয়েছে 'দুর্ভোগ গ্রহণযোগ্য'।

মূলত একজন ব্যক্তি 'বিকল্প-ক' বাছাই করার মাধ্যমে নিজের মুখে নিজেই ঘুষি মারে এবং অভিযোগ করে যে, সে ব্যথা পাচ্ছে। তবুও তারা এটা বারবার করতেই থাকবে।

তারা নিজেরা দুর্ভোগে থাকা সত্ত্বেও অন্যদেরও বলবে এমনটা করতে।

একমাত্র তখনই এসব ঘটা বন্ধ হবে যদি তারা 'বিকল্প-ক' পরিবর্তন করে 'বিকল্প-খ' বেছে নেয়।

যতদিন তারা মেনে নিতে থাকবে 'দুর্ভোগ গ্রহণযোগ্য', ততদিন দুর্ভোগের এই চক্র ভাঙ্গা অসম্ভব ।

মূলত এসব লোকেরা নিজেরাই নিজেদের জন্য দুর্ভোগ ডেকে আনছে।

আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে কেনো মানুষ 'বিকল্প-ক' বেছে নেয় ?

- লোকেরা বিকল্প-ক বেছে নেয় কেননা তারা বিশ্বাস করতে চায় বা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় 'দুর্ভোগ গ্রহণযোগ্য'।

কারণ তারা মেনে নিতে পারে না, 'দুর্ভোগ গ্রহণযোগ্য নয়'

এবং তারা সন্তান জন্ম দেয়।

এর মানে তারা জানে তাদের সন্তান জীবনভর প্রতিনিয়ত দুর্ভোগে থাকবে।

আর তারা যদি মেনে নেয় 'দুর্ভোগ গ্রহণযোগ্য নয়' তবে তাদের সন্তান জন্ম দেওয়ার কাজটি নিশ্চিতভাবেই অনৈতিক ও নিষ্ঠুর। (কেননা তারা একটি মানুষকে জীবনভর দুর্ভোগ দিচ্ছে)

তারা এটাও জানে যদি তারা মেনে নেয় যে, 'দুর্ভোগ গ্রহণযোগ্য নয়' তাহলে তারা যে অন্য লোকদের ব্যবহার বা দাস করছে সে কাজটাও নিশ্চিতভাবেই অনৈতিক ও নিষ্ঠুর।

'দুর্ভোগ গ্রহণযোগ্য' এমনটা মেনে নেওয়ার আরেকটা কারণ- অন্যথায় আপনাকে মেনে নিতে হবে 'দুর্ভোগ গ্রহণযোগ্য নয়'। আর যখনই আপনি মেনে নিবেন 'দুর্ভোগ গ্রহণযোগ্য নয়' তখনই আপনার জীবনের সবকিছু গভীর থেকে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। কারণ আপনি বুঝতে পারবেন আপনাকে মগজধোলাই এবং ব্যবহার করা হয়েছে।

আপনি এটাও বুঝতে পারবেন যে, আপনি নিজেও এতদিন অন্যদের মগজধোলাই এবং ব্যবহার করে এসেছেন। আর এজন্য আপনাকে স্বীকার করে নিতে হবে, আপনি এতদিন একজন স্বার্থপর, নৈতিকতা বিবর্জিত এবং নিষ্ঠুর মানুষ ছিলেন, এককথায় খারাপ মানুষ ছিলেন।

(যদি আপনি কারো দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভোগের জন্য দায়ী হয়ে থাকেন)

পাশাপাশি আপনি এটাও বুঝতে পারবেন যে, জীবন বা অস্তিত্ব হচ্ছে বন্দীশালা ও দুর্ভোগ।

অর্থাৎ, জীবন বা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা চরমতম বোকামি।

সমস্যা হলো, এ সকল উপলব্ধি এড়িয়ে যাওয়া যায় না কেননা এগুলো জীবন বা অস্তিত্বের সকল ক্ষেত্রে ও সকল পর্যায়ে প্রযোজ্য। আর তাই বেশিরভাগ মানুষই এটা মেনে নিতে পারে না। ফলে তারা এই বিভ্রমে থাকতেই পছন্দ করে যে, 'দুর্ভোগ গ্রহণযোগ্য'।

**পাশ দ্রষ্টব্য:** তারা হয়তো বলবে 'দুর্ভোগ প্রয়োজনীয়',

'জীবন সুন্দর' কিন্তু এগুলো কেবল নিজেদের 'দুর্ভোগ গ্রহণযোগ্য' বলে মগজধোলাইয়ের অন্য পদ্ধতি।

**দ্রষ্টব্য:** এই মিথ্যা বা বিভ্রম (দুর্ভোগ গ্রহণযোগ্য) যে কেবল তাদের জন্য দুর্ভোগ ডেকে আনে তা নয় বরং এটা কার্যকরী হয় যদি তারা অন্যদেরও এই মিথ্যাটি বিশ্বাস করাতে পারে।

এ কারণেই সবাই চায় অন্য সবার মগজধোলাই করে এই মিথ্যাটি বিশ্বাস করাতে।

আর অন্যদের বিশ্বাস করাতে নিজেদেরকেও মগজধোলাই করতে হয় যে, কাউকে জন্ম দেওয়া গ্রহণযোগ্য।

তারা শুধুমাত্র সত্যের মুখোমুখি হওয়ার অস্বস্তি থেকে বাঁচতে অন্যদেরকে দুর্ভোগে রাখতে কুণ্ঠিত হয় না।

আর যখন তারা মনে করে তারা ও অন্যরা সন্তান নিতেই পারে তখন তারা অপরিমেয় দুর্ভোগ সৃষ্টি করে কেননা সকল সন্তানকে জীবনভর প্রতিনিয়ত দুর্ভোগ পোহাতে হবে।

প্রতিটি মানুষ প্রতিদিন প্রতিনিয়ত দুর্ভোগ পোহাতে বাধ্য হচ্ছে কারণ মানুষ অন্যদের এটা বিশ্বাস করাতে মগজধোলাই করে যাচ্ছে যে, সন্তান জন্ম দেওয়া গ্রহণযোগ্য, ভালো, গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়।

যুগের পর যুগ ধরে প্রতিটি মানুষকে এতসব দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। কারণ লোকেরা সত্যের মুখোমুখি হওয়ার অস্বস্তি থেকে কিছুটা হলেও পরিত্রাণ চায়।

'কিছুটা' বলার কারণ- নিজের ও অন্যদের জীবনভর দুর্ভোগ সৃষ্টির পরেও তারা সত্যের মুখোমুখি হওয়ার অস্বস্তি পুরোপুরিভাবে এড়াতে পারে না।

তাহলে তো বলা যেতেই পারে, এই ধরনের মানুষ বা সমাজ নির্বোধ।

আর নিশ্চিতভাবেই এরা স্বার্থপর, নৈতিকতা বিবর্জিত, নিষ্ঠুর এবং খারাপ মানুষ।

**(ক)-**ধরনের মানুষ বা সমাজ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কত শতকোটি মানুষের জন্য দুর্ভোগ সৃষ্টি করেছে তা বর্ণনা করতে এ শব্দগুলোও অতি নগন্য।

যা ভেবে দেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে,

এসব লোকদের নিজেদেরকে ও অন্যদেরকে মগজধোলাই করে বিশ্বাস করাতে হয় যে, সন্তান জন্ম দেওয়া গ্রহণযোগ্য কাজ। কেননা যদি 'সন্তান জন্ম দেওয়া গ্রহণযোগ্য নয়' মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে এটাও মেনে নিতে হবে যে, জীবন বন্দিত্ব, নির্যাতন, দাসত্ব।

কেউ যদি মেনে নেয় 'জীবন বন্দিত্ব, নির্যাতন, দাসত্ব' তাহলে তাকে পাশাপাশি মেনে নিতে হবে, বেঁচে থাকাও চরমতম বোকামি।

আর যদি কেউ 'বেঁচে থাকা চরমতম বোকামি' মেনে নেয়  তাহলে তাকে এটাও মেনে নিতে হবে যে, সবচেয়ে বিচক্ষণ কাজ হবে যত দ্রুত সম্ভব জীবন বা অস্তিত্ব থেকে মুক্তি লাভ করা।

তাহলে মূল কথা হচ্ছে,

যখনই মানুষ স্বীকার করে নিবে সন্তান জন্ম দেওয়া স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠুরতা তখনই তাদের জীবনের সব হিসেবনিকেশ উল্টে যাবে। যেহেতু মানুষ জীবনের হিসেবনিকেশ উল্টে যাওয়ার অস্বস্তি পছন্দ করে না তাই তারা সত্যকে অস্বীকার করে বা বিভ্রমেই থাকতে চায়।

অথচ তারা সত্যকে অস্বীকার করতে বা বিভ্রমে থাকতে পারবে না যদি না অন্য সকলেও সত্যকে অস্বীকার করে বা বিভ্রমে থাকে।

এজন্যই মানুষ চায় অন্য সবাই সত্যকে অস্বীকার করুক বা বিভ্রমে থাকুক।

আর যতদিন জীবনের সত্যকে অস্বীকার করা হবে ততদিন দুর্ভোগ থাকবেই।

**দ্রষ্টব্য:** মগজধোলাই করে যে দুটি বিশ্বাস মানুষের মস্তিষ্কে গভীরভাবে গেঁথে দেওয়া হয়েছে তা হলো-

**১.** জীবন ভালো, মৃত্যু খারাপ।

এবং

**২.** অস্তিত্ব ভালো, অস্তিত্বহীনতা খারাপ।

অবশ্য এমন আরো অনেক বিশ্বাস লোকেরা মগজধোলাই করে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করে, তবে সেগুলো কিছুটা এ দুটির মতোই।

যেমন-

**ক)** জীবন বা অস্তিত্ব মূল্যবান, বিশেষ কিছু, প্রয়োজনীয় ইত্যাদি।

এবং

**খ)** মৃত্যু বা অস্তিত্বহীনতা অনৈতিক, স্বার্থপর, অগ্রহণযোগ্য ইত্যাদি।

ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা সবকিছুই এ দুটি মিথ্যার ভিত্তির উপর টিকে আছে।

যা কিছুর ভিত্তি মিথ্যা সেটাও নিশ্চয়ই মিথ্যা।

আর জীবনের ৯৯%ই যখন এ দুটি মিথ্যার উপর টিকে আছে তাই জীবনের ৯৯%ই দুর্ভোগের হবে এটাই স্বাভাবিক। (যেহেতু মিথ্যা দুর্ভোগ ডেকে আনে)

মিথ্যা যত গভীর হয় আমাদের জীবনের সত্য তত কম চোখে পড়ে। ফলে দুর্ভোগের চক্র বন্ধ করা কঠিনতর হয়ে যায়।

আমাদের জীবন এ দুটি মিথ্যার উপর কতটা টিকে আছে তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক-

'আমার এক গ্লাস পানি লাগবে' আপনার এমনটা বলা সম্ভব ছিলো না যদি এর পেছনে 'জীবন ভালো, মৃত্যু খারাপ' ধারণা অন্তর্নিহিত না থাকতো।

আপনি যদি মেনে নিতেন 'মৃত্যু ভালো, জীবন খারাপ' তাহলে আপনি মৃত্যু চাইতেন, হয়তোবা মরেও যেতেন। (বেঁচে থাকার জন্য পানি চাইতেন না।)

আসলে আমাদের কাজ, শখ, সবকিছু (যেমন: সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, পরিবার, বাচ্চা নেওয়া ইত্যাদি) 'জীবন ভালো, মৃত্যু খারাপ' মিথ্যাটির উপর টিকে আছে।

**দ্রষ্টব্য:** এটা উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ যে,

'জীবন ভালো, মৃত্যু খারাপ' এই মিথ্যা ধারণা দিয়ে পরোক্ষভাবেও খুব সহজে মগজধোলাই করা সম্ভব। এমনকি পরোক্ষ মগজধোলাই, প্রত্যক্ষ মগজধোলাইয়ের চেয়ে কল্পনাতীতভাবে বেশি কার্যকর। কেননা এতে যার মগজধোলাই করা হবে সে জানতেও পারবে না তাকে মগজধোলাই করা হয়েছে অথচ সে মগজধোলাই করা বিশ্বাস দ্বারাই পরিচালিত হবে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মগজধোলাইয়ের পার্থক্য -

**প্রত্যক্ষ মগজধোলাই** হচ্ছে যখন আপনি কাউকে ঠিক ঐ বিষয়টা দ্বারাই মগজধোলাই করবেন যা দিয়ে করতে চান।

যেমন- আপনি যদি কাউকে এটা বিশ্বাস করাতে চান যে,

'জীবন ভালো, মৃত্যু খারাপ' তবে আপনি 'জীবন ভালো, মৃত্যু খারাপ' দিয়েই মগজধোলাই করবেন।

**পরোক্ষ মগজধোলাই** হলো, যখন আপনি যা দিয়ে মগজধোলাই করতে চান তা দিয়ে না করে অন্য কিছু দিয়ে মগজধোলাই করবেন যেটা ঘুরেফিরে 'জীবন ভালো, মৃত্যু খারাপ' এটাতেই গিয়ে পৌঁছাবে।

**পাশ-দ্রষ্টব্য:** যখন লোকেরা বলে, গার্মেন্টস কর্মীদের শোষণ করা হচ্ছে এবং এই শোষক কোম্পানিদের কাছ থেকে পোশাক কিনলে পরোক্ষভাবে শোষণকে সমর্থন করা হয়, তখন লোকেরা যে ভুলটা করে তা হচ্ছে গার্মেন্টস সিস্টেমটাকে দোষারোপ করা।

দোষারোপ যদি করতেই হয় তাহলে তাদেরকে করতে হবে যাদের সন্তানরা এসব গার্মেন্টসে শোষিত হতে বাধ্য হয় এই বিশ্বাসে যে 'জীবন ভালো, মৃত্যু খারাপ'।

যদি পৃথিবীর কাউকে এই বিশ্বাস দ্বারা মগজধোলাই করা না হতো তাহলে শোষিত হওয়ার জন্য কোনো শ্রমিক থাকতো না।

ফলে এই শোষণ-ব্যবস্থাও টিকে থাকতো না।

মূলকথা হলো, যদি 'জীবন ভালো, মৃত্যু খারাপ' এই বিশ্বাস আপনার মধ্যে না থাকে তাহলে জীবনে যখন আপনি এমন কিছুর মুখোমুখি হবেন যা গ্রহণযোগ্য নয় (দুর্ভোগ) তবে আপনি সোজা সেখান থেকে চলে আসতে ভয় পাবেন না।

আপনি যদি বুঝতে পারেন, জীবন বা অস্তিত্বই অগ্রহণযোগ্য তাহলে আপনি জীবন বা অস্তিত্ব থেকেই চলে যেতে চাইবেন।

মানুষের ভোগান্তির একমাত্র কারণ -

মানুষের মগজধোলাই  করা হয়েছে যে, 'জীবন ভালো, মৃত্যু খারাপ'।

এজন্যই সবাইকে ভুগতে হচ্ছে।

তাহলে মূল প্রশ্ন হচ্ছে,

সবার এই ভোগান্তির জন্য আসলে দায়ীটা কে ?

উত্তরটা হলো, সবাই।

কারণ মানুষ প্রতিনিয়ত অন্য সবাইকে এমন সকল বিষয় দিয়ে মগজধোলাই করছে যা মানুষকে বিশ্বাস করাবে,

'জীবন ভালো, মৃত্যু খারাপ'।

তাহলে অবস্থা হলো এই,

সবাই সবার দুর্ভোগের জন্য দায়ী! আর এটা চলতেই থাকবে যতক্ষণ না সবাই এটা বুঝতে পারে এবং অন্যদের মগজধোলাই বা ব্যবহার করার চেষ্টা বন্ধ করে।

আর মানুষ তাদের অধীনস্থদের যেসব বিষয়ে মগজধোলাই করে তার মধ্যে প্রধান হলো, 'দুর্ভোগ গ্রহণযোগ্য'।

অনেকে জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু মিথ্যা বলে যেন পরোক্ষভাবে তাদের মগজধোলাই করে 'দুর্ভোগ গ্রহণযোগ্য' বিষয়টা বিশ্বাস করানো যায়।

আর 'দুর্ভোগ গ্রহণযোগ্য' কথাটা আপনি তখনই বিশ্বাস করবেন যখন মেনে নিবেন, 'জীবন বা অস্তিত্ব ভালো এবং মৃত্যু বা অস্তিত্বহীনতা খারাপ'।

**দ্রষ্টব্য:** আপনি যদি মনে করেন, 'দুর্ভোগ গ্রহণযোগ্য নয়' তাহলে আপনি সহজাতভাবেই সন্তান জন্ম দিতে পারবেন না, কাউকে ব্যবহার বা দাস করতে পারবেন না। কারণ আপনি স্বাভাবিকভাবেই চাইবেন না কেউ দুর্ভোগ পোহাক।

এমনটা করার একটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলো, আপনি কম ভুগবেন এবং পৃথিবীতে কিছু দুর্ভোগ কমবে অথবা দূর হবে।

এমনভাবে কিছু দুর্ভোগ কমানো বা দূর করার পর আপনি অস্তিত্বের আরো গভীরতর পর্যায় সম্পর্কে সচেতন হবেন এবং স্বাভাবিকভাবেই সেসব দুর্ভোগও কমাতে চাইবেন।

অবশ্য অস্তিত্বের যে স্তরটি দুর্ভোগ থেকে শতভাগ মুক্ত হবে তা হচ্ছে, অস্তিত্বহীনতা।

অর্থাৎ যদি মানুষ বা সমাজ 'বিকল্প-খ' বাছাই করে তাহলে 'দুর্ভোগ গ্রহণযোগ্য নয়' এই বিশ্বাস জীবনের অংশ হয়ে যাবে না বরং সবাইকে দুর্ভোগ মুক্ত করার কেবল একটি দিকনির্দেশক হবে।

আর যখন দুর্ভোগ থাকবে না অর্থাৎ অস্তিত্বই থাকবে না তখন সেখানে কোনো বিশ্বাসও থাকবে না।

**পাশ-দ্রষ্টব্য:** আমি যদিও এগুলোকে দিকনির্দেশক বলেছি তবুও এগুলো আসলে দিকনির্দেশক নয়। কারণ এগুলো আপনাকে কোথায় যেতে হবে বা কী করতে হবে তা বলবে না বরং কোথায় যাওয়া যাবে না বা কী করা যাবে না (কারো দুর্ভোগ সৃষ্টি করা যাবে না) সেটাই বলবে। এটা মেনে চললে আপনি শেষ পর্যন্ত অস্তিত্বহীনতাতেই গিয়ে পৌঁছাবেন।

**দ্রষ্টব্য:** আমি বলছি না সবকিছু অস্তিত্বহীনতায় গিয়ে পৌঁছাক। আমি শুধু বলছি আপনার জীবনকে স্বচ্ছভাবে, সৎভাবে পর্যবেক্ষণ করুন, করে যা পাবেন সেটাই মেনে নিবেন।

এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, আমাদের একটি দৃঢ়, অখন্ডনীয় শুরু খুঁজে বের করতে হবে কারণ তাহলে যে ফলই আসুক সেটাকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

এটি গুরুত্বপূর্ণ কেননা আপনি যদি এমনটা না করেন তাহলে জীবনকে স্বচ্ছ বা সৎভাবে পর্যবেক্ষণ করে পাওয়া ফল আপনার পছন্দ না হলে আপনি হয়তো আবার পিছন থেকে শুরু করতে চাইবেন যাতে ফলটা পরিবর্তন করা যায়।

এমনটাই সবাই করে, আর এজন্যই পৃথিবীতে এতো দুর্ভোগ।

তাহলে এটা স্পষ্ট যে, এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে।

প্রথমত, সকল জীবনকে সৎভাবে অথবা স্বচ্ছতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আর পর্যবেক্ষণ করতে হবে, জীবনের কোনো ক্ষেত্র বা দিক বাদ না দিয়ে।

দ্বিতীয়ত, আপনার একটা দৃঢ় শুরু থাকতে হবে যা নিশ্চিত করবে, আপনি যে ফল বা সমাধান খুঁজে পান না কেনো তাকে এড়িয়ে যেতে পারবেন না। আর এর ফলে আপনি আর বিভ্রান্ত হবেন না এবং দুর্ভোগের চক্রকে ভাঙতে পারবেন ।

শুরুটা যদি নিরপেক্ষ বা সত্য হয় তাহলে আপনি কেবল জীবনের একটি ক্ষেত্রেই নয় বরং সকল ক্ষেত্রেই দুর্ভোগের চক্রকে ভাঙতে পারবেন।

যদি পূর্বনির্ধারিত বা উদ্দেশ্যমূলক না হয় তাহলে এভাবে প্রাপ্ত ফল বা সমাধানকে কেবল আপনি নন, কেউই অস্বীকার করতে পারবে না।

---

# সারাংশ

বইয়ের মূল বিষয়ে যাওয়ার পূর্বে সবকিছুর জন্য একটি নিরপেক্ষ বা আদর্শ 'সূচনা বিন্দু' প্রতিষ্ঠা করা জরুরি।

'সূচনা বিন্দু'টা আসলে কী সেটা ব্যাখ্যা করার আগে আমাদের বুঝতে হবে এটা থাকা কেন প্রয়োজন।

মানুষেরা একে অপরের সাথে মিশে কারণ তারা তার থেকে কিছু পাওয়ার আশা করে।

এমন অনেক কৌশল বা হাতিয়ার আছে যা দ্বারা তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য মানুষটিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

কিন্তু সবচেয়ে সাধারণ হাতিয়ার বা কৌশল হচ্ছে সেসকল কথা যা দিয়ে-

**১.** বিভিন্ন বিশ্বাস, ধারণা ইত্যাদি তৈরি করে এবং টিকিয়ে রাখে।

**২.** বিভিন্ন নিয়ম বা সিস্টেম ইত্যাদি তৈরি করে এবং টিকিয়ে রাখে।

এটা সকল পর্যায়েই ঘটে। এমনকি ছোট কোনো দলের সদস্যরাও চেষ্টা করে তাদের বিশ্বাস, ধারণা, নিয়ম অন্য সবার উপর চাপিয়ে দিতে, যা দলের সবাই বিশ্বাস করবে।

যেমন- কোনোকিছু ভালো নাকি মন্দ, সঠিক নাকি বেঠিক, নৈতিক নাকি অনৈতিক, গ্রহণযোগ্য নাকি অগ্রহণযোগ্য ইত্যাদি।

অবশ্য একজন ব্যক্তি বা দল এগুলো চাপিয়ে দিতে চাওয়ার একমাত্র কারণ এগুলো থেকে তারা লাভবান হবে এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রুরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এই বইটির একটি সম্ভাব্য সমস্যা হচ্ছে, বইটি চায় দুর্ভোগ কমাতে বা প্রতিরোধ করতে। আর কোনো ধরনের দুর্ভোগ কমাতে বা প্রতিরোধ করতে ওই দুর্ভোগের পিছনের প্রকৃত কারণ বুঝতে ও স্বীকার করে নিতে হবে। আর সমস্যাটা ওইখানেই।

কেননা বেশিরভাগ মানুষই এমনটা পছন্দ করে না।

কারণ-

**১.** এতে তাদের এবং অন্য সবার কাছে কিছু তিক্ত সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। আর কোনো ব্যক্তি এমন কোনো সত্য শুনতে চায় না যা সবার সামনে প্রকাশ করে দিবে যে, সে অনেক স্বার্থপর ও নৈতিকতা বিবর্জিত কাজ করছে এবং অন্যদের জন্য দুর্ভোগ সৃষ্টি করছে।

**২.** এতে তাদের কল্পনার রাজ্য ভেঙে যাবে। আর কেউই চাইবে না তাদের কল্পনার রাজ্য ভেঙে যাক। কেননা তারা তাদের জীবনের অধিকাংশ সময়ই এই কল্পনার রাজ্য তৈরি করতে এবং টিকিয়ে রাখতে ব্যয় করেছে।

মানুষ এমনটা ঘটুক চাইবে না এবং তাদের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে চেষ্টা করবে নিজেদের এবং অন্য সবাইকে বুঝাতে যে, এসকল তথ্য (যা তাদের জন্য হুমকিসরূপ) সত্য নয়।

এমনটা করার অনেক উপায় আছে। তবে সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে তাদের জন্য হুমকিস্বরূপ তথ্যগুলোকে মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টা করে যাওয়া এবং তাদের জন্য লাভজনক বিশ্বাস বা নিয়মগুলো তৈরি করা ও টিকিয়ে রাখা।

আসলে এটা একটা জয়-পরাজয়ের খেলা বা লড়াই, যেখানে যুক্তিই হাতিয়ার।

আর তারা যদি এই লড়াইয়ে হারতে শুরু করে তখন তারা বলবে-

- এটা কেবলই আপনার ব্যক্তিগত ধারণা বা বিশ্বাস ।
- সত্য বলে কিছু হয় না।
- ভালো-মন্দ, সঠিক-বেঠিক এসবের কোনো সর্বজনস্বীকৃত মানদণ্ড নেই।

... ইত্যাদি।

মূলকথা হলো, এই জয়-পরাজয়ের লড়াই সবাই চালিয়ে যাচ্ছে আর সেজন্যই দুর্ভোগ শেষ হচ্ছে না।

তাই এই বইতে সকলের সব দুর্ভোগ দূর করার এমন এক পদ্ধতি বের করার চেষ্টা করা হয়েছে যা দুর্ভোগের আড়ালের সত্যকে এমন যুক্তিযুক্তভাবে প্রকাশ করবে যেন কেউ সেটা এড়িয়ে যেতে বা তার বিরোধিতা না করতে পারে।

এমনটা করা তখনই সম্ভব হবে, যদি একটি নিরপেক্ষ বা সত্যিকারের সূচনা বিন্দু থেকে শুরু করা যায় এবং যৌক্তিকভাবে আগানো যায়।

এই প্রক্রিয়ার একটি অংশ হবে শব্দগুলোকে নিরপেক্ষভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেন তা সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হয়।

চলুন তবে শুরু করা যাক-

একটি সত্যিকারের 'সূচনা বিন্দু' হলো তা যেটা সকলের জন্যই সত্য।

আর এমন সত্য কিছু পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো, বাস্তব কিছু থেকে শুরু করা।

সকলের জন্য তেমনই একটি বাস্তব বিষয় 'দুর্ভোগ'।

তাহলে সকলের জন্য নিরপেক্ষ বা সত্যিকারের সূচনা বিন্দু হচ্ছে-

'দুর্ভোগ বাস্তব'

আর এটাকে অবশ্য প্রমাণযোগ্য হতে হবে।

প্রমাণ করাই কেবল যথেষ্ট নয় প্রমাণটি হতে হবে-

> **১.** বাস্তব ভিত্তিক (কেবল তাত্ত্বিক বা দার্শনিক নয়)।
>
> **২.** সবাই যাতে নিজেই প্রমাণ করতে পারে এমন। (কেউ একজন প্রমাণ দিবে আর সবাই মেনে নিবে এমন নয়)
>
> **৩.** যেন যতবার প্রয়োজন ততবারই প্রমাণ করা যায়। (এটি যেন কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য না হয়)

**দ্রষ্টব্য:** দুর্ভোগ এতটাই সুস্পষ্ট যে এটিকে প্রমাণ করে দেখানো জরুরি নয়।

তবুও সবসময় এমন কিছু লোক থাকবে যারা এর বিরোধীতা করবে যেন তারা তাদের স্বার্থপর ও অনৈতিক কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

তাই এসব লোকেরা যদি প্রমাণ দেখতে চায় তবে তাদেরকে নিম্নোক্তভাবে প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে-

তাদেরকে 'দুর্ভোগ বাস্তব' এটা দেখাতে যা করতে হবে তা হলো- তাদেরকে দুর্ভোগ দিতে হবে এবং দুর্ভোগের মাত্রা বাড়িয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না তাদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে।

তখন তারা স্বীকার করবে-

**১.** দুর্ভোগ বাস্তব।

**২.** দুর্ভোগ কেউই চায় না।

**৩.** সবাই স্বাধীনতা চায় (তারা যন্ত্রণার পরিস্থিতি থেকে মুক্তির স্বাধীনতা চাইবে এবং তা চাইবে বেদনাহীন ও তাৎক্ষণিক উপায়ে )

তাদেরকে যদি বলা হয়, 'আরো কিছু সময় পর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়া হবে কিংবা এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে নতুন যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে' তাহলে তারা সেটা মেনে নিবে না।

এতেই প্রমাণ হয়, দুর্ভোগ বাস্তব। আর এই সত্যিকারের 'সূচনা বিন্দু' থেকে সবাই শুরু করতে পারে।কেননা এখন আমরা এমন কিছু পেলাম যা সবার কাছেই বাস্তব এবং সত্য।

আর যেহেতু আমরা প্রমাণ করেছি, 'দুর্ভোগ কেউই চায় না' সেহেতু বলা যেতে পারে,

যেকোনো যন্ত্রণা বা দুর্ভোগ কাউকে দেওয়া অসম্মতিমূলক কাজ।

তাই এখান থেকে আমরা অন্য শব্দগুলোকেও সংজ্ঞায়িত করতে পারি, যেহেতু আমরা জানি 'দুর্ভোগ বা যন্ত্রণা বাস্তব এবং এটা কেউ চায় না' তাই-

যে ব্যক্তি অন্য কারো দুর্ভোগ সৃষ্টি করে সে অনৈতিক, খারাপ বা ভুল কাজ করছে। আর এটা যদি মাত্রা ছাড়ায় তখন এটাকে নিষ্ঠুর কাজ বলা যায় এবং এমনটা যদি করতেই থাকে তখন এটাকে বলা হয় পৈশাচিক কর্মকাণ্ড।

তাহলে 'অনৈতিক', 'খারাপ', 'ভুল', 'নিষ্ঠুর' এ শব্দগুলোকে সত্যিকারের 'সূচনা বিন্দু' থেকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য।

এটাকে আমরা আরেকটু এগিয়ে নিয়ে যাই-

কাউকে দেওয়া যন্ত্রণা সীমা ছাড়ালে আগের তিনটি বিষয়ের পাশাপাশি সে আরো স্বীকার করে নিবে-

**৪.** তারা যদি এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি চায় এবং তাদের সেই স্বাধীনতা দেওয়া না হয় তবে তাদের অবস্থা বা জীবন বন্দিত্ব।

**৫.** যে সমাজ বা সিস্টেম মানুষকে এমন বন্দিত্ব বা নিপীড়নের জীবনে থাকতে বাধ্য করে তারা নৈতিকতা বিবর্জিত ও নিষ্ঠুর।

**৬.** এখানে মাঝামাঝি বলে কিছু নেই। কেননা হয়, দুর্ভোগ থেকে মুক্তির স্বাধীনতা আছে অথবা নেই।

**৭.** যেহেতু মাঝামাঝি কিছু নেই তাই বিতর্কেরও কোনো অবকাশ নেই।

**৮.** যদি দুর্ভোগ থেকে মুক্তির অধিকার না থাকে তবে কাউকে বন্দী বা নির্যাতন করা যেতেই পারে।

আর এর মানে হলো সমাজ বা সিস্টেম আসলে নির্যাতন, নিপীড়ন, দাসত্ব ও বন্দিত্বের পক্ষে।

আর তারা যখন আরো গভীরে যাবে তখন উপলব্ধি করবে যে, খারাপকেও দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়-

**খারাপ** = যে অন্যের সাথে খারাপ আচরণ করে।

**চরম খারাপ** = যে নিজের জন্ম দেওয়া জীবের (সন্তান) সাথেই খারাপ আচরণ করে।

তাহলে কাউকে দুর্ভোগ দেওয়া খারাপ কিন্তু কাউকে সৃষ্টি করে বা জন্ম দিয়ে দুর্ভোগ দেওয়া আরো খারাপ।

'চরম খারাপ' শব্দটি বেশি বেশি মনে হতে পারে। তাই অন্য একটি শব্দ ব্যবহার করা যেতো কিন্তু এমন কোনো শব্দ নেই যা এই কাজটি কত খারাপ তার তীব্রতা বোঝাতে পারে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা সত্যিকারের 'সূচনা বিন্দু' থেকেই খারাপের সংজ্ঞা পেয়েছি। আর তারপর উপলব্ধি করেছি, দুই ধরনের খারাপের মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য আছে। আর সেজন্যই চরম শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

'চরম খারাপ' শব্দটি ব্যবহার করা এজন্যই যথোপযুক্ত কারণ, যে মানুষেরা নতুন কারো জন্ম দেয় তারা অস্তিত্বশীল সকল দুর্ভোগের জন্য দায়ী।  তাই তাদের চেয়ে খারাপ কেউ হতে পারে না।

এটা সুস্পষ্ট, যদি লোকেরা নতুন কাউকে জন্ম দেওয়া অব্যাহত না রাখতো তাহলে অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেতো এবং কোনো দুর্ভোগ থাকতো না।

থাকতো কেবল '**অস্তিত্বহীনতার শান্তি**'।

এই বইয়ে সেই পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হবে, যার মাধ্যমে-

**১.** স্থায়ীভাবে দুর্ভোগ কমানো বা প্রতিরোধ করা যায়।

**২.** গভীরতর স্বাধীনতা, শান্তি, ভালোবাসা পাওয়া যায়।

এবং

**৩.** অস্তিত্বহীন হওয়া যায়।

সেই পদ্ধতিগুলো সবার জন্য প্রযোজ্য হতে হবে।

যেহেতু মানুষ উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতেই যাবতীয় কর্ম সম্পাদনা করে থাকে, তাই এই বইয়ের উদ্দেশ্য হবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো খোঁজা-

**১.** গভীরতর আকাঙ্ক্ষা যা সবার জন্য প্রযোজ্য হবে।

(যদিও সবার ভিন্ন ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা আছে কিন্তু সব আকাঙ্ক্ষাই আসলে সেই মৌলিক আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভরশীল )

**২.** সকল দুর্ভোগের কারণ।

**৩.** সকল দুর্ভোগের সমাধান।

**৪.** উপলব্ধি বা সমাপ্তি, যা জীবনের সব দিকের জন্য প্রযোজ্য হবে।

এগুলো প্রযোজ্য হবে-

**১.** জীবনের সকল ক্ষেত্রে।

**২.** জীবনের সকলের পর্যায়ে।

**৩.** সকল মানুষ বা সত্তার ক্ষেত্রে।

এই তিনটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়াকে হাস্যকর মনে হতে পারে। কিন্তু সকল দুর্ভোগই টিকে এই তিনটি বিষয়কে অবহেলা করার কারণে।

মানুষ যদি এই তিনটি বিষয় সত্যিই বুঝতো তাহলে পৃথিবীতে কোনো দুর্ভোগই থাকতো না।

এই তিনটি বিষয়কে আরো গভীরভাবে ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে।

'জীবনের সকল ক্ষেত্রে' এবং 'জীবনের সকল পর্যায়ে' এই দুটি বিষয় একই রকম মনে হতে পারে। কিন্তু এদের আলাদা উদাহরণ দিলে পার্থক্য স্পষ্ট হবে।

চলুন তাহলে শুরু করি-

আপনি যদি জীবনের সকল ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ না করেন তাহলে আপনি সহজাতভাবেই দুর্ভোগ সৃষ্টি করছেন।

কেননা-

**১.** জীবনের সকল ক্ষেত্রই একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

**২.** আপনি জীবনে ছোট বড় অনেক কিছুই করেন। তাই আপনি যদি শুধুমাত্র বড় ক্ষেত্রগুলোকে বিবেচনায় নেন এবং ছোট ক্ষেত্রগুলোকে এড়িয়ে যান তবুও আপনাকে ভুগতে হবে।

**৩.** যদি জীবনের একটি ক্ষেত্রকেও এড়িয়ে যান তবে সেটাই হতে পারে আপনার দুর্ভোগের কারণ। আর তা যদি আপনার জন্য দুর্ভোগ সৃষ্টিকারী না হয় তবে অন্য কারো দুর্ভোগ সৃষ্টি করবে। আর সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা দুর্ভোগ সংক্রমিত হয়ে আপনার কাছেও পৌঁছাবে।

**৪.** আপনি যদি জীবনের ক্ষেত্রগুলো থেকে পছন্দমত বেছে বেছে পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে আপনি সেগুলোই বাছাই করবেন যেগুলো-

**(ক)** আপনার বর্তমান বিশ্বাসকে জোরদার করে।

**(খ)** আপনাকে নৈতিক ও নিঃস্বার্থ হিসেবে তুলে ধরে।

**(গ)** আপনার স্বার্থপর বা অনৈতিক কর্মকান্ড চালিয়ে যাওয়া সমর্থন করে।

**(ঘ)** আপনার পুরোনো বিশ্বাস ভেঙে এমন নতুন বিশ্বাস সৃষ্টি করে যা (খ) এবং (গ) এর ভিত্তিতে আপনার জন্য ভালো।

জীবনের সকল ক্ষেত্রকে সহজ করে বুঝতে একটি উদাহরণ হতে পারে-

অনেকে কেবল জীবনের কিছু দিক পর্যবেক্ষণ করে।

যেমন: কীভাবে বড় বড় সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলো পৃথিবীর সকল দুর্ভোগের কারণ।

তারা এমন দিক বেছে নেয় যেন তারা যে পৃথিবীতে অপরিমেয় দুর্ভোগ সৃষ্টি করছে তা প্রকাশ হয়ে না পড়ে।এ দুর্ভোগ তারা সৃষ্টি করছে-

**(ক)** সরাসরি মানুষের দুর্ভোগ সৃষ্টির মাধ্যমে।

যেমন: তারা প্রতিনিয়ত এমন কিছু কাজ করছে যা তাদের পরিচিত মানুষদের (সন্তান, বন্ধু, পরিবার, সহকর্মী ইত্যাদি) দুর্ভোগ সৃষ্টি করে।

**(খ)** পরোক্ষভাবে মানুষের দুর্ভোগ সৃষ্টির মাধ্যমে।

যেমন: তারা প্রতিনিয়ত এমন কিছু কাজ করছে যা এমন মানুষদের দুর্ভোগ সৃষ্টি করছে যাদের তারা সরাসরি চেনে না। (যেমন- কারাখানায় বা সেবায় নিয়োজিত কর্মীদের)

**দ্রষ্টব্য:** দুর্ভোগের পরিমাণ এতো বেশি কারণ যখন আপনি কোনো একজন ব্যক্তির দুর্ভোগ সৃষ্টি করেন সেটা অন্য অনেক মানুষের কাছে সংক্রমিত হয়। ফলে দুর্ভোগ দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায়।

আর দুর্ভোগ দীর্ঘস্থায়ী হয় কেননা দুর্ভোগের কারণ প্রচ্ছন্ন থাকে অথবা বলা যায় দুর্ভোগের কারণ গভীরে নিহিত থাকে।

কাউকে যদি মিথ্যা দ্বারা মগজধোলাই করা হয়ে থাকে তাহলে সে গভীরতর পর্যায়ে যেতে না পারায় এটা দেখতে পায় না।

জীবনের সকল পর্যায়কে সহজ করে বুঝতে একটি উদাহরণ হতে পারে-

বেশিরভাগ মানুষই কেবল জীবনের গভীরতর পর্যায়গুলো পরীক্ষা করে দেখে এবং অন্য পর্যায়গুলোকে ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যায়।

তারা এমনটা করে তারা যে অনৈতিক ও স্বার্থপর খেলা খেলছে তার কৌশল হিসেবে।

এর মানে তারা জানে যে, তারা কিছু অনৈতিক কাজ করেছে এবং করে যাচ্ছে আর তাই কৌশল হিসেবে গভীরতর পর্যায়কে বেছে নেয় যেন তারা বলতে পারে-

**১.** আমি-তুমি আলাদা কেউ নই, তাই আমি কারো দুর্ভোগ সৃষ্টি করিনি।

**২.** কার্যকারণ বলে কিছু নেই।অতএব, আমি কারো কষ্টের কারণও নই।

**৩.** 'দুর্ভোগ' কেবল একটি ধারণামাত্র।

**৪.** 'বাস্তব', 'আসল', 'সত্য' বলে কিছু হয় না, এগুলো কেবলই ভ্রম।

**৫.** আপনি যা বলছেন তা কেবল আপনার মতামত।

**৬.** চিন্তা বা কাজ এমনিতেই ঘটে তাই আমি আমার চিন্তা বা কাজের জন্য দায়ী নই। (যদিও তা অন্যের দুর্ভোগ সৃষ্টি করে )

ইত্যাদি।

অবশ্য যদিও তারা এগুলো বলে তবুও তারা বা তাদের প্রিয়জনেরা অন্যদের দ্বারা ভোগান্তির শিকার হলে অভিযোগ করবে।

তারা কেবল অভিযোগই করবে না বরং তারা ভোগান্তি সৃষ্টিকারীর শাস্তিও চাইবে।

তাহলে মোদ্দাকথা হলো, যা জীবনের এক ক্ষেত্রে করা হয় তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সবার জন্য প্রযোজ্য হবে।এজন্য সবকিছু ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে হতে হবে।

অন্যথায়, দুর্ভোগ সৃষ্টি হবেই।

কারণ যদি কারো সাথে অন্যায় বা বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় তাহলে সে আইন বা নিয়মের তোয়াক্কা না করে এমন আচরণ করবে যা দুর্ভোগ সৃষ্টি করে।

মানুষ যদি জীবনের একটি ক্ষেত্রে সমতার প্রয়োগ করে তাহলে এটি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে হবে।

**দ্রষ্টব্য:** এমনটা করাতে কোনো ক্ষতি নেই, কেননা এটা বর্তমান সিস্টেমের চেয়ে ভালোই হবে।

যদি আপনি জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমতার প্রয়োগ করতে পারেন তাহলে আইন, পুলিশ, শাস্তি, কারাগার ইত্যাদির কোনো প্রয়োজন হবে না।

দুঃখজনক ব্যাপার হলো, মানুষ এমনটা কখনোই চাইবে না। কারণ মানুষ সমতা চায় না। মানুষ অন্যদের চেয়ে শ্রেয়তর, অধিকতর ধনী, অধিকতর সফল হতে চায় এবং অন্যদের অধীনস্থ করে রাখতে চায়।

তারা চায় লড়াইয়ের ময়দান তাদের অনুকূলে থাকুক, যাতে তাদের স্বার্থপর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে।

পৃথিবীতে সহজাতভাবেই সবসময় দুর্ভোগ থাকবে। কারণ মানুষ চায় অধীনস্থ শ্রেণিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু আইন বা নিয়ম থাকুক যা তাদের নিজেদের জন্য প্রযোজ্য হবে না।

উদাহরণস্বরূপ- যদি মানুষ এই সিদ্ধান্তে উপনিত হয়, কারো সম্মতি ব্যতীত বা কারো সাথে জোরপূর্বক যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হওয়া অপরাধ বা ধর্ষণ।

তাহলে এমন আইন তৈরি ও প্রয়োগ করা এবং অনুমতিহীন কর্মকান্ডকে নিপীড়ন বলে সংজ্ঞায়িত করা যেতেই পারে।

যাই হোক,  এই সংজ্ঞা বা আইন গ্রহণযোগ্য হতে হবে-

**১.** সব ধরনের লোকের কাছে।

এর মানে, সকল ধরনের অনুমতিহীন কর্মকান্ডই অবৈধ, তা সেটা যার সাথেই (নারী, পুরুষ, শিশু, জাত-পাত, বয়স নির্বিশেষে) করা হোক না কেনো।

এবং

**২.** জীবনের সকল ক্ষেত্রে।

অর্থাৎ, এটা কেবল যৌনসঙ্গমের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে না, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

এগুলো সহজ এবং বোধগম্য মনে হলেও এসবের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন আছে। কেননা এগুলোই পৃথিবীর এত এত দুর্ভোগের জন্য দায়ী প্রধান কারণ।

যেহেতু প্রতিটি ক্রিয়ারই একটি বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে তাই মানুষের তৈরি নিয়ম বা আইন তাদেরকে অন্যায়ের হাত থেকে রক্ষা করে এবং বিপরীত ক্রিয়া হিসেবে দেখা যায় যে ক্ষমতাবানেরা শোষণের কাজে তা ব্যবহার করছে।

উক্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা আপনাকে সীমিত পরিসরে সুবিধা দিচ্ছে এ কথা অস্বীকার করছি না তবে আপনিও একথার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারবেন না যে, উক্ত নিয়ম-শৃঙ্খলার দ্বারা ক্ষমতাবানেরা বিশেষ সুবিধা ভোগ করছে যা সাধারণের জন্য দুর্ভোগ বা ভোগান্তি সৃষ্টি করে।

আপনি যদি আপনার মনমতো নৈতিকতা-অনৈতিকতার মানদণ্ড সমাজব্যবস্থায় সকল কিছুর উপর আরোপ করতে চান তা আপনার জন্য যেমন কষ্টসাধ্য হবে, তেমনই অন্যের জন্য যন্ত্রণাকর হবে।

আর তাই যন্ত্রণা উপশম বা চিরতরে নির্মূল করতে কোনো প্রকার নিয়ম-শৃঙ্খলা বা আইনের দ্বারস্থ হওয়া যাবে না। কেননা এসব নিয়ম-শৃঙ্খলা বা আইনের পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

যেখানে নিরপেক্ষ বা আদর্শিক সূচনা বিন্দু থেকে উদ্ভূত নৈতিকতার পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না এবং তা কারোর উপকার বা ক্ষতির কারণ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না তাই এটা এখন পরিস্কার যে, এরকম নিরপেক্ষ নৈতিকতার বাইরে কিছু করা অবশ্যই নির্বুদ্ধিতা।

উদাহরণস্বরূপ, ধরুন আপনি জানেন কোথা থেকে সকল যন্ত্রণার সৃষ্টি হচ্ছে বা সকল যন্ত্রণার মূল সম্পর্কে আপনি অবগত তবুও আপনি নির্বোধের মতো সে কাজই বারবার করছেন যা যন্ত্রণা সৃষ্টি এবং দীর্ঘায়িত করছে। এটি অবশ্যই আপনার নির্বুদ্ধিতা।

নির্বুদ্ধিতাকে নিচে সংজ্ঞায়িত করা হলো-

**নির্বুদ্ধিতা** = নিজের দুর্ভোগ ডেকে আনা।

যদিও নির্বুদ্ধিতার এই সংজ্ঞা কেবল গল্পের একটা অংশ।

যদি আপনি কারোর জন্য দুর্ভোগ সৃষ্টি করেন এটা সহজাতভাবে আপনাকেও দুর্ভোগ দিবে।

**দ্রষ্টব্য:** আপনি সকল কিছুকে আলাদা আলাদা অথবা এক, যাই ভাবেন না কেনো এটা সকল ক্ষেত্রেই সত্য।

আবার আপনি যদি অন্য কারো জন্য সামান্যতমও দুর্ভোগ সৃষ্টি করেন তা ঘুরেফিরে আপনাকেই সংক্রমিত করবে।

আর এমন ছোট ছোট আঘাত প্রতিনিয়ত চলতেই থাকবে এবং আপনাকে দুর্ভোগ দিতেই থাকবে।

সেজন্য নির্বুদ্ধিতার সংজ্ঞাকে আরেকটু ব্যাপকভাবে বলা যায়,

**নির্বুদ্ধিতা** = নিজের জন্য বা অন্যের জন্য দুর্ভোগ ডেকে আনা।

তাই যদি একজন মানুষ স্বার্থপর ও নৈতিকতা বিবর্জিত হয় সে আসলে নির্বোধ।

**দ্রষ্টব্য:** এ থেকে অনিবার্য যে সিদ্ধান্তে আসা যায় তা হলো,

সকল ধরনের দুর্ভোগের সত্যিকারের সমাধান তখনই সম্ভব যখন সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অর্থাৎ সকল দুর্ভোগ সত্যিকার অর্থে দূর করতে হলে সকল সত্তার সকল দুর্ভোগ দূর করতে হবে।

এর মানে, আপনি যদি স্বার্থপরভাবে শুধু নিজের দুর্ভোগ দূর করতে বা কমাতে চান সেটা কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

কেননা সমাধানে সবাই অন্তর্ভুক্ত।

উপরের কথাগুলো থেকে এটা স্পষ্ট যে, আপনি যদি জীবনের সকল ক্ষেত্র ও সকল পর্যায় সব মানুষের জন্য পর্যবেক্ষণ করেন তবে যে ফলটি অনিবার্য তা হলো-

**১.** সবকিছুই প্রকাশিত হবে এবং কিছুই গোপন থাকবে না।

**২.** কেউই বাদ পড়বে না।

**৩.** ফলাফল এবং উপলব্ধি তখন হবে স্পষ্ট, সত্য।

এর মানে আপনি উপলব্ধি করবেন, অন্য লোকদের জন্য আপনি দুর্ভোগ সৃষ্টি করছেন। সকল মানুষ যদি এটাকে (দুর্ভোগ) গ্রহণযোগ্য মনে করে তবুও এটা সত্য।

**দ্রষ্টব্য:** উপরের তথ্যগুলোতে এটা স্পষ্ট করা হয়েছে, কেউই যন্ত্রণা থেকে রেহাই পায় না এবং যন্ত্রণার সমাধানে কেউ বাদ না পড়ার ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ।

এজন্য এই বইটি সকল মানুষের পাঠযোগ্য হওয়া প্রয়োজন এবং সকল পর্যায়ের তথ্য এতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

তাই এই বইতে সহজ ভাষায় ব্যাপারগুলো বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

---

আমাদের ভাবনার সবচেয়ে বড় সংকীর্ণতা হলো, আমরা সততার সাথে ভাবতে পারি না। আমাদের যারা ব্যবহার করছে তারা আমাদের এমনভাবে মগজধোলাই করে রেখেছে যে অনেক স্পষ্ট সত্যও আমাদের চোখে পড়ে না।
যদি সৎভাবে ভাবতে পারতাম তবে প্রথমেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতো, "আমরা কি অস্তিত্বে আসতে চেয়েছি?"
আমরা সবাই মানি কারো উপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া অনৈতিক।  অথচ চারপাশে এতো শিশুর উপর জীবন চাপিয়ে দেওয়ার মতো অনৈতিক ঘটনাকে আমরা মেনে নিচ্ছি, এমনকি উদযাপনও করছি। কিন্তু কেন এমন পরস্পরবিরোধী আচরণ?

জীবনে চলার পথে আমরা অনেক সময়ই এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হই যখন আমাদের মনে হয়, আমরা যদি অস্তিত্বহীন হয়ে যেতে পারতাম! চোখের সামনে প্রতিনিয়ত নিজের ও প্রিয়জনদের কষ্ট দেখে, জীবনের জটিলতার পুনরাবৃত্তিতে অতিষ্ঠ হয়ে উপলব্ধি করি আমাদের জন্ম না হলেই ভালো হতো। অর্থাৎ, আমাদের সবার মধ্যেই অস্তিত্বহীনতার আকাঙ্ক্ষা আছে। যেখানে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অস্থিরতার নাম দেওয়া হয়েছে 'জীবন' সেখানে অস্তিত্বহীনতায় আছে প্রকৃত ও গভীরতর শান্তি। সে শান্তিতে যারা আছে তাদের অস্তিত্বে এনে পৃথিবীতে যন্ত্রণার পরিমাণ বাড়ানোর কি আদৌ আবশ্যকতা আছে?

– শামস অর্ক